অহল্যা উদ্ধার

আশাপূর্ণা দেবী

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা — ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ—আষাঢ় ১৩৭০

প্রকাশক— ভোলানাথ দাস
সপ্তর্ষি,
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক— কনক কুমার বসুঠাকুর
সুমুদ্রণী
৪/৫৬এ. বিজয়গড়. কলিকাতা - ৭০০ ০৩২

অহল্যা উদ্ধার

স্নেহের শুভাশিস্

স্নেহের গোধুলি

যুগল করকমলেষু

নাতির হাত ধরে মেলায় ঘুরছিলেন দেবনাথ। ধরেছিলেন শক্ত হাতে। যেন নৌকোর হাল ধরেছেন, কিছুতেই বানচাল হতে দেবেন না। কিন্তু ঢেউ ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে! সামনে চাপ পিছনে ঠেলা। সর্বশক্তি প্রয়োগ ছাড়া উপায় নেই।

নাতি রেগে উঠেছিল, আঃ দাদু! হাতটা ভেঙে দেবে নাকি? আমার বুঝি লাগে না?

হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল।

তবু বজ্রমুষ্টি শিথিল করেনি দেবনাথ।

কণ্ঠে মধু ঝরিয়েছিলেন, কী করবো দাদু, তোমার মা যে বলে দিয়েছে, শক্ত হাতে ধরে রেখো বাবা! ছেলে ভীষণ ছটফটে।

তবে বুড়ির পাকাচুল কিনে দাও।

ওরে বাবা! খেলেই অসুখ।

পাঁপর ভাজা?

মাথা খারাপ! মেলার পাঁপর মানুষে খায়?

ওই যে গাদা গাদা লোক খাচ্ছে, ওরা হি হি মানুষ নয়? গরু?

বুদ্ধি সুদ্ধি গরুর মত!

তবে আলুচানা খাব!

আলুচানা! সর্বনাশ! চানা মানে জানিস?

না।

'চানা' মানে ছোলা।

হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই তো, ছোলাইতো! খাবো!

ওসব হচ্ছে ঘোড়ার ছোলা বুঝলি?

ঘোড়ার ছোলা! ঘোড়ার ছোলা আবার কী?

ইয়ে, মানে পচাছোলা।

তুমি মিথ্যুক। কিনে দেবেনা তাই! ওরা সবাই পচাছোলা খাচ্ছে?

ওরা বুড়ো ধাড়ি। ওদের সহ্য হয়। তুমি একটা ছোটছেলে। গাদা গাদা ছোটছেলে নেই বুঝি ওখানে? দেখোনা! দেখো!

দেবনাথ তাকিয়ে দেখলেন।

হঠাৎ যেন অবাক হয়ে গেলেন। সত্যি কী গাদা গাদা লোক। বয়সের ভেদ নেই, শ্রেণীভেদ নেই। কাতারে কাতারে চলেছে। চলেছে ফিরছে, ঘুরছে, এগিয়ে যাচ্ছে। আবার পিছন থেকে নতুন ঢেউ আসছে। আশ্চর্য! চিরকাল এগিয়ে চলেছে এই মানুষের মিছিল!

'মাহেশের রথ' কতদিনের, তা' জানেননা দেবনাথ। আট দশ বছর হলো মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন এখানে, মেয়ের এবং তার শ্বশুর বাড়ীর লোকের, বহু অনুরোধেও এযাবৎ রথে আসা হয়নি। এবারে রিটায়ার করেছেন, তাই আর ছাড়লনা ওরা। তার মানে 'মাহেশের রথ' আর তার মেলা দেখা দেবনাথের এই প্রথম। অথচ—তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছে, কতো কতোবারই যেন তিনি এই মিছিলের সামিল হয়ে এখানে ঘুরেছেন। ওই নাগরদোলা, ওই দোকান সারি, ওই মাটিতে চট পেতে মালা ঘুনসি, তেলকমাটি ইত্যাদি হরেক তুচ্ছ মাল নিয়ে বসে থাকা বুড়িটা, ওই বড় বড় দোকানের আশে পাশে ছোট্ট ছোট্ট দোকানে সস্তা পুতুলের সম্ভার। ওই বাসন কোশন ধামা কুলো বঁটি কাটারির সমারোহ, এ সমস্তই দেবনাথের ভীষণ চেনা লাগছে। যেন অনন্তকাল ধরে দেখে চলেছে।

আর ওই বহুকণ্ঠনিঃসৃত বিরাট কলরোল থেকে উত্থিত যে ওঙ্কার ধ্বনির মত একটা ধ্বনি, ওর মধ্যে যেন দেবনাথের কণ্ঠস্বর নিহিত রয়েছে।

কেন? কেন?

কবে এসেছেন এখানে দেবনাথ? জীবনেও তো না। তবে? তবে কেন হঠাৎ এমন মনে হচ্ছে? যেন দেবনাথ রায় নামের মানুষটা যে নাকি এই সেদিন পর্যন্ত ভারত সরকারের একটি বিশেষ বিভাগে ক্লাশ-ওয়ান অফিসারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং যার বিদায় কালে 'ফেয়ার-

ওয়েল' দেবার সময় অনেকেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল, তার আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। সে এই অন্তহীন পথযাত্রার এক সত্তাহীন শরিক্ মাত্র !

কেমন যেন ভয় পেলেন দেবনাথ। ঝাপসা ঝাপসা অস্তিত্বটাকে খুঁজে পাবার জন্যেই বুঝি হাতে ধরা কচি হাতটাকে আরো চাপ দিলেন।

আঃ দাদু ! আবার অতো চাপছো ? আর কক্ষণো তোমার সঙ্গে আসবো না। কিছু কিনে দেবে না, খালি হাতে ব্যথা করিয়ে দেবে। ছাই পচা বিচ্ছিরি দাদু।

॥ ২ ॥

কিন্তু খানিক পরে সেই বিদ্রোহী ছেলেটাকেই হঠাৎ প্রবল কান্নার সঙ্গে 'দাদু দাদু' রবে চীৎকার করতে শোনা গেল।

পাড়ার এই বিচ্ছু ছেলেটি অনেকেরই চেনা, কে একজন দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি কাছে এসে শুধোলে. কোথায় গেছে তোমার দাদু ?

জানিনা।

আর কে সঙ্গে ছিল ?

কেউ না।

দাদুর হাত ধরে ছিলেনা ?

কী করে ধরব ? দাদুইতো আমার হাত ধরে ছিল। চেপ্ েপ ধরে হাত ব্যথা করে দিয়েছিল। মামার বাড়ির দাদুটা ভীষণ পাজী !

ছি ছি ও কথা বলতে নেই।

বলবই তো ! হাত ছেড়েদিল কেন ?

কখন ছেড়ে দিল ?

জানিনা।

কোনদিকে গেল ?

জানিনা।

....

না, এতোক্ষণ ধরে দেবনাথের শক্তমুঠোয় কব্জা হয়ে থাকা ছেলেটা জানেনা কখন তার হাতটা সেই বজ্র আঁটুনি থেকে ফসকে বেরিয়ে এসে-ছিল। জানেনা সেই হাতের মালিক কোন দিকে চলে গিয়ে হারিয়ে গেছে।

জানবার কথাও নয়।

তার দৃষ্টির সীমানা তো এই জনারণ্যের নীচের দিকটুকু পর্যন্ত। সে শুধু দেখে চলেছে রাশি রাশি প্যান্টের চলন্ত পা। দেখেছে রাশি-রাশি দ্রুত ধাবমান ধুতি লুঙ্গি শাড়ির নীচের দিকের অর্ধাংশ। মুখ দেখতে পায়নিতো কারো।

দেখতে দেখতে ছোট ছেলেটা সেই দ্রুত ধাবমানের ধাক্কা খেয়েছে। ধাক্কা খেতে খেতে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়েছে। আর তখনই দিশেহারা হয়ে পরিত্রাহী চিৎকার শুরু করেছে। 'এই পাজী দাদু, এই পাজী দাদু আমায় ছেড়ে দিলি কেন?

॥ ৩ ॥

ছেলেটাতো জানে না।

কিন্তু সেই বয়স্ক লোকটাই কি জানে কখন সে নৌকোর হালধরা মুঠোটা আলগা করে ফেলেছিল, কখনো দৃক্‌পাতহীন ভাবে ভীড়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছিল।

এগিয়ে ? না কি পিছিয়ে ? কোনমুখো সেই যাত্রাটা ? দূরদুরান্তর থেকে যারা এসেছে, তারাতো আবার সেই দূরদূরান্তরেই ফিরবে ?

ফিরবে খেয়ানৌকো ধরে ওপারে। ফিরবে ইষ্টিশানে পৌঁছোনো গাড়ি চেপে। ফিরবে রিকশয়, গরুর গাড়িতে পায়ে হেঁটে।

গরুরগাড়িও আছে বৈ কি। থাকবেও চিরকাল।

যেখানে অন্য কিছু নেই আর কেউ নেই সেখানে ও ছাড়া আর কে আছে ?

যে পথে সভ্যতার রথচক্র এগোতে পারেনা, সে পথের জন্যে ও থাকবে নম্র অপেক্ষায়। হাজার বছর ধরে থেকেছে, আরো হাজার হাজার বছর ধরেই থাকবে হয়তো। দেবনাথ ওই ফিরতিদের কোনো একটা ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে একটা গোরুর গাড়িতে চেপে বসলেন। দেবনাথের এটাই খুব চেনা চেনা মনে হল।

যত এগোতে থাকেন, মনে হতে থাকে এই পথ ধরে কত কত বার যেন গিয়েছেন এসেছেন। আশ্চর্য, দেবনাথের মনের মধ্যে এর জন্যে কোনো প্রশ্নও নেই। ভাবছেন না এরকমটা হচ্ছে কেন !

ভাবছেন না, তার কারণ দেবনাথ রায় নামের মানুষটা মেলার ভীড়ে হারিয়ে গেছেন।

দেবনাথের বজ্রমুষ্টি থেকে হঠাৎ খসে পড়ে যাওয়া সেই দুর্বিনীত

শিশুটা চেঁচাতে শুরু করেছিল, এই পাজীদাদু, হাত ছেড়ে দিলি কেন? আমি যে হারিয়ে যাচ্ছি।' ....তখন সেই শব্দগুলো দেবনাথের কানে কিছু কিছু পৌঁছেছিল, শব্দগুলো একত্র করে যে অর্থটা পাওয়া যায়, তাও হৃদয়ঙ্গম হচ্ছিল, কিন্তু অনুভব করতে পারছিলেন না কে কাকে বলছে : কার এই আর্তকণ্ঠ।

মেলা থেকে উত্থিত ওঙ্কার ধ্বনির মত, সামগ্রিক ধ্বনিটার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সেই ক্রুদ্ধ আর্ত শিশুকণ্ঠ।

॥ ৪ ॥

দেবনাথের জামাই বাড়িতে তখন প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে দেবনাথের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে সমালোচনা উত্তাল হয়ে উঠেছে।

যাই বল বৌমা, তোমার বাবার এই কাজটি ভাল হয়নি। অদ্ভুত লাগছে। এতোদিন সরকারি অফিসে একটা উঁচু পোস্টে কাজ করে এলেন কি করে বলোতো? এই দায়িত্বজ্ঞান?

ভাগ্যিস সুবোধরা দেখতে পেয়েছিল, তাইনা ছেলে ফিরে পাওয়া গেলো, নইলে কী হতো?

নইলে কী হতো' ভেবে শিউরেছে সবাই। ঘরে বাইরে।

ছেলেটাকে জেরা করাও ফুরাচ্ছেনা, ঠিক করে বল, কখন দাদু তোর হাত ছেড়ে দিল?

ছ বছরের ছেলে, কথায় ছত্রিশ বছরের।

রেগে জবাব দেয় কী করে জানবো? আমার হাতে কী ঘড়ি পরা আছে?

শেষকালে কী বলেছিল তোকে?

শেষকাল আবার কী! কেবলই তো বলছিল, দেখো বাবু সাবধান! হাত ছাড়িয়ে নিওনা যেন।

তুই বুঝি হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছিলি?

বেণু যেন তবু একটা ধরবার জিনিস পায়। বাপের এই দায়িত্বহীন ব্যবহার বাবদ, ঘরে বাইরে অম্লমধুর ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ নানাবিধ মন্তব্য শুনতে শুনতে দুঃখে লজ্জায় রাগে, আর বাপের উপর অভিমানে, বেণু যেন খান খান হয়ে যাচ্ছে। অথচ কোনো প্রতিবাদ করার উপায় নেই।

দেবনাথ রায় নামের মানুষটার বয়েস, সম্পর্ক, শিক্ষাদীক্ষা প্রতিষ্ঠা

ইত্যাদি হিসেব করলে, কে তাঁর এই কাজকে সমর্থন করবে ? নাঃ কোনো যুক্তিতেই সমর্থন করতে পারা যায় না। মানেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবু বেণু সমুদ্রে তৃণখণ্ড আঁকরায়, তুই বুঝি হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছিলি ?

সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয় বেণুকে।

তা আর না ? আমার ভারী সাধ্যি। যা শক্তহাত তোমার বাবার লোহার মতন। আমার হাতটা ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল। তোমার বাবা বিচ্ছিরী।

এই ছেলেই গতকাল বলেছে, মামার বাড়ির দাদু খুব ভাল। এ বাড়ির দাদুর থেকে অনেক অনেক ভাল। কতো ফর্সা।'

'এ বাড়ির দাদু' শুনতে পেয়ে হেসে বলেছিলেন, তবে এই কালো দাদুটাকে ছেড়ে ফর্সা দাদুর কাছেই থাকগে যা।

ও দাদুতো কলকাতায় থাকে।

তাতে কী ? তুই কলকাতায় গিয়ে থাকবি।

আহা ! আহ্লাদ ! আর আমার ইস্কুলটায় কে যাবে শুনি ? তুমি ?

এইস্কুল ছেড়ে দিবি। কলকাতায় কতো ভাল ভাল ইস্কুল, সেখানে ভর্তি হবি। ফর্সা দাদুর সঙ্গে পার্কে বেড়াতে যাবি।

এ কথার উত্তর খুঁজে না পেয়ে বাবুয়া রেগে উঠে বলেছিল। তুমি বিচ্ছিরি ! তুমি পচা।

কিন্তু এতো 'অমৃতং বালভাষিতং।' এতে কে আর গুরুত্ব দিতে যায় ? এ নিয়ে শুধু হাসাহাসিই চলে।

গতকাল রাত্রেই একসঙ্গে খেতে বসে রমেন ডাক্তার বলেছেন, দেখো বৌমা, ফর্সা বাবাকে পেয়ে যেন আবার এই কালো বিচ্ছিরি বাপটিকে একেবারে ভুলে যেওনা। এ পাতেও একটু নজর দিও।

দেবনাথ হেসে উঠে বলেছেন, আপনি এপাতে যা 'নজরটি' দিচ্ছেন বেয়াই মশাই, আপনাকেই না হয় দায় সামলাতে হয়। হয়তো মাঝরাত্তিরে বদহজমের ওষুধ খুঁজতে বসতে হবে।

সম্পর্কটা কৌতুকের, 'সম্পর্ক,ও মধুর।

গতকাল এসে পর্যন্ত অনাবিল হাস্যকৌতুক খোস গল্পের চাষ চলছিল। আজ বয়স্ক লোকটার এই অস্বাভাবিক অসাবধানতায় সবই মলিন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেল।

রমেন ডাক্তার একবার হয়তো পরিস্থিতি হালকা করতেই বললেন, নাতিকে অসুখ হবার ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করে, বেয়াই মশায় নিজেই, বোধহয় কোথাও বসে মেলাতলার বেগুনী ফুলুরি ওড়াচ্ছেন কিনা দেখোগে যাও।

কিন্তু কৌতুকটা মাঠে মারা গেল। কেউ কান দিল না।

দেখে দেখে তো এলো অনেকেই বারে বারে। অবশ্যই তিনি এখনো হাতছাড়া বস্তুটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন হাহাকার করে। ছেলে বাড়ী চলে এসেছে সেটা জানিয়ে, তাঁর হয়রানিটা লাঘব করতে হবে তো?

তারপর বাড়ী এসে যা করবার করা।

কুটুম মানুষ, করা আর কতটুকু যাবে? বাড়ীর কেউ হলে বা হ্যানস্থা করতে পারা যেতো, তার দশ ভাগের এক ভাগও নয়। তবু প্রতিবেশীরা অনেকেই উৎসুক হয়ে এই বাড়িতেই ঘোরাঘুরি করছে, আসামীকে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মূর্তিতে দেখতে। অস্ফূট গুঞ্জন ক্রমেই সরব হয়ে উঠছে।

ডাক্তারবাবুর বেয়াই যে এমন, তা তো জানা ছিল না। চিরদিন জেনে এলাম 'শ্যামলের শ্বশুর একজন কেষ্ট বিষ্টু লোক, তাঁর এমন হালকা বুদ্ধি?' ছেলেটাকে যদি ওরা দেখতে না পেতো—, 'যদি না পেতো!'

সেই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাটাকে কেউই আর মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেনা।

ওদিকে যারা দেবনাথকে বৃথা হয়রানির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ভলান্টিয়ার ক্যাম্প থেকে মাইকে ঘোষণা করে চলেছে, দেবনাথ রায়, বাবুয়াকে পাওয়া গেছে, যেখানেই থাকুন ভলান্টিয়ার ক্যাম্পে চলে আসুন। দেবনাথ রায়, মাহেশের রমেন ডাক্তারের বাড়ি! শুনুন—

আপনার নাতি বাবুয়াকে পাওয়া গেছে। যেখানেই থাকুন ভলান্টিয়ার ক্যাম্পে চলে আসুন। ···দেবনাথ রায়, আপনি যদি ভলান্টিয়ার ক্যাম্প খুঁজে না পেয়ে থাকেন, আপনার আত্মীয় রমেন ডাক্তারের বাড়ি চলে যান। বাবুয়া বাড়ি চলে গেছে।

রমেন ডাক্তারের ছোট ছেলে কমল এই ভলান্টিয়ার ক্যাম্পের একজন পাণ্ডা। বহুবিধ ভাবেই ঘোষণা করল সে বহুক্ষণ ধরে। কেউই ভলান্টিয়ার ক্যাম্পে চলে এল না।

বন্ধুরা বলল, চলে গেছে। চলে গেছে। আগেই চলে গেছে। আর কেন মিথ্যে সোরগোল তুলছিস।

একজন আবার রহস্যের হাসি হেসে বলল, তোর দাদার শ্বশুরের 'পান-দোষ টোষ' নেই তো রে কমল? থাকলে মেলার পেছন মাঠে একবার খোঁজ করে দেখ।

পিছন মাঠে তাড়ি আর ধেনো মদের কারবার চলছে। তার কাছাকাছিই তাঁবু পড়েছে তাদের, আবহমান কাল থেকে যারা, এইভাবেই সুরার কাছাকাছি তাঁবু ফেলে ফেলে মানুষের আদিম প্রবৃত্তির রসদদারের ভূমিকা নিয়ে আসছে।

কমল বলল, ধ্যেৎ! মোটেই উনি ওরকম না।

তোর তো দাদার শ্বশুর। কলকাতায় থাকে, তুই জানিস কী রকম? বাড়ি গিয়ে দেখগে। যদি ফিরে না গিয়ে থাকে, নির্ঘাৎ ওই মাঠে পাবি।

বলতে যাচ্ছিল, অথবা কোনো তাঁবুতে', কমলের মনোভঙ্গী দেখে সাহস করল না।

এদিকে বাড়ির লোক দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, কতক্ষণে ভগ্নদূতের মূর্তিতে ফিরে এসে হাহাকার করে ওঠেন, ওরে বেণুরে তোর বাবুয়াকে আমি হারিয়ে ফেললাম!

বেণু ভেবেছিল বাবা ফিরে এলে, বাবুয়ার আগমন বার্তা জানিয়ে

সকলের সামনে বাবাকে যাচ্ছেতাই করবে। যে যা বলেছে তাঁর সম্বন্ধে সব বলে দেবে। শোধ নেবে সকলের ওপর। কিন্তু শোধ নেওয়া আর হলনা তার। ক্রমেই একটা অজানা ভয়ে হাত পা কাঁপতে থাকলো, ছেলে হারিয়ে ফেলে লজ্জায় ধিক্কারে বাবা গঙ্গার দিকে চলে যাননি তো? অথবা কোথাও জ্ঞান হারিয়ে পড়ে নেই তো··· ? চলে যাননি তো কোথাও মুখ দেখাবার লজ্জায়?

নিজের মনের ভাবনা বেণু কারো কাছে ব্যক্ত করছিল না। অন্য পাঁচজনে এই সিদ্ধান্তে এলো। লজ্জায় ধিক্কারে মুখ দেখবার ভয়ে শ্যামলের শ্বশুর কলকাতায় চলে গেছেন। ধারণা করতে তো পারেন নি বাবুয়া বাড়ি চলে এসেছে চেনা লোকের কাঁধে চড়ে।

কলকাতায় কাউকে পাঠালে হতো না?

আজ এই রাত্রে আর কে যাবে? কাল সকালে দেখা যাবে।

সকালে তো অনেকেই যাবে কলকাতায়। পাড়ার বেশীর ভাগ পুরুষই তো ডেলী প্যাসেঞ্জার। শ্যামল নিজেই তো। ····

বেণুর চিঠি লেখার খাটুনী বাঁচাতে, এবং মানসিক শান্তি বজায় রাখতে শ্যামল প্রায়ই শ্বশুরের খোঁজ খবর নিতো তাঁর অফিসে ফোন করে। তিনিও তাই। দেবনাথ রিটায়ার করার পর এই ক'মাসে সে সুবিধেটি গেছে। নেহাৎ বেণুর অনুযোগ অভিযোগে এক আধটা শনিবারের সুখময় সন্ধ্যাটি উৎসর্গ করতে হয় শ্বশুরের খবরের জন্যে।

শাশুড়ীহীন শ্বশুরবাড়িতে যাবার আকর্ষণই বা কি? ভদ্রমহিলাকে অবশ্য চোখে দেখেনি শ্যামল, অনেক আগেই তাঁর বিয়োগ ঘটেছে, তবু অনুভব করে ঐ অভাবটা। তাছাড়া—অফিস থেকে দূরও তো কম নয়। যাওয়া আসা একটা দুরূহ ব্যাপার।

কালকের জন্য তোলা থাকলো সেই দুরূহ কাজটি। অদ্ভুত কাণ্ড করলেন বটে ভদ্রলোক।

ক্ষমার অযোগ্য।

নেহাৎ গুরুজন বলে চুপ করে থাকা।

এতোবড়ো একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়ে তুমি পালিয়ে গেলে? যখনই ভাবা যাচ্ছে—যদি বাবুয়াকে না পাওয়া যেতো তখনই দেবনাথের অপরাধের পাল্লা ভারী হতে হতে মাটিতে নামছে। তবু যেতেই হবে তাঁকে আশ্বস্ত করতে।

সকলেই যখন সিদ্ধান্তে স্থির হলো, কলকাতায় গেলেই দেখা হয়ে যাবে দেবনাথের সঙ্গে, তখন যথারীতি খাওয়া দাওয়া সারলো। বেণুকেও খেতে হল সকলের বকুনিতে। তার কেবল উথলে উথলে কান্না আসছে। বাবার জন্যে যত্ন করে রান্না করে রেখেছিল।

সামনের কোনো ছুটিতে চলে যাবে বাবার কাছে। দেবনাথের উদ্দেশ্যে যা কিছু মন্তব্য আর সমালোচনা হয়েছে এতোক্ষণ, বেণুর মনে হচ্ছে তার সব বুঝি বাবাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সামনেই বলা হয়েছে। বাবার সেই মর্মান্তিক বেদনাবিদ্ধ মর্মাহত মূর্তিটকেই মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে বেণু।

কিন্তু বাবার কাছে কি আর যাওয়া হল বেণুর?

অনেক দুরূহ খাটুনি খেটে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ অবধি নিশ্চিত হওয়া গেল রথের মেলায় মেলাতলার ভীড়ে বেণুর ছ'বছরের ছেলেটা হারায়নি, হারিয়ে গেছে বেণুর ছাপ্পান্ন বছরের বাবা।

মাথার কোনো গণ্ডগোল ছিল না তো?

বৈরাগী বৈরাগী ভাব ছিল না তো? বউমরা লোক।

দূর। বউ কি আজ মরেছে? তখন আবার বিয়ে করার বয়েস ছিল।

মেলাতলায় কতোরকম লোক আসে। ইতর ভদ্র। কেউ কোনো গুণতুক করে ভুলিয়ে নিয়ে গেল না তো?

আহা একটা আধবুড়ো লোককে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে কার কি লাভ হবে।······

দু পাঁচ দিন আলোচনা উত্তাল।

ক্রমশঃ ফেনা মরে, জল থিতিয়ে যায়।

শুধু বেণু নামের মেয়েটা কিছুতেই এই ভাবনাটা ছাড়তে পারেনা, 'কেন মরতে আমি বাবাকে আসতে বলেছিলাম। কেন মরতে আমি আহ্লাদ করে বলেছিলাম, 'যাও বাবা নাতির হাতধরে মেলাতলায় বেড়িয়ে এসো।'

মজ্জাগত কুসংস্কারের কাঁটা ঝোপ, মাঝে মাঝেই কাঁটা ফোটায়, 'এই নিয়তি ছিল বলেই হয়তো বাবার রথের সময় আসার বরাবরই অনিচ্ছে ছিল। আমার 'নিয়তি' আমায় এই অপরাধের ভাগী করলো নিজের দোষে আমি বাবাকে হারালাম।

আর কিছু নয়, ইচ্ছে করেই নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া। এমন তো যায় কত মানুষ, হঠাৎ কোন শুভ অথবা অশুভক্ষণ বৈরাগ্যের হাওয়া এসে জীবন তরণীর পালে লাগে, বিকল চিত্ত মানুষ ব্যাকুল হয়ে চলে যায় সংসার ছেড়ে।

তবু কিছু সন্দেহ রইল বৈ কি দেবনাথ রায় নামের মানুষটা কি আদৌ সে ধরণের ছিলেন? তাই বেণুর কান বাঁচিয়ে অন্য কথাও বলাবলি করছে কেউ কেউ কোথাও কোনো 'শত্রু' ছিল না তো দেবনাথের? কর্মজীবনে অথবা সাংসারিক জীবনে? যেমন শত্রু সুযোগ সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল, এই গোলমালের মধ্যে কোনো ভাবে ভুলিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে আশপাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে নিকাশ করে ফেলেছে। ....কি বললে? ....শত্রু ছিল না? থাকতে পারে না? অজাত শত্রু ছিলেন মানুষটা? হুঁঃ! তাই কি আর হয়? অলক্ষে কোথায় কি হয়, কোথায় কে থাকে, জানা যায় কি?

মেয়ে পুরুষে যে ডজন দেড়েক লোক শেয়ারে একখানা গরুরগাড়ি ভাড়া করে, 'তেঁতুলগাছি' নামক কোন এক গণ্ডগ্রাম থেকে 'মাহেশের রথ' দেখতে এসে দিন দু'তিন একটা বেলা মেলাতলার আশে পাশে ইঁট পেতে কাঠকুটো জ্বেলে ভাত ফুটিয়ে খেয়ে, আর অন্যবেলাটা সর্ববিধ

মারাত্মক খাদ্য কিনে খেয়ে খেয়ে কাটিয়ে, এবং মেলার প্রান্তসীমায় কাঠের কেঠকো বারকোশ, চাকি বেলুন, খুরশী পীঁড়ি আর শিলনোড়ার ব্যাপারীদের ছাউনির আনাচে-কানাচে চটবিছিয়ে শুয়ে কাটিয়ে, সেই বিকেলে ফের গরুর গাড়িতে চাপতে যাচ্ছিল তাদের তেঁতুলগাছির উদ্দেশ্যে তাদের দেখে, অথবা গরুরগাড়ি সমেত সমগ্র দৃশ্যটাই দেখে দেবনাথের খুব চেনা মনে হলেও, তাদের অবশ্যই দেবনাথকে 'চিরচেনা' মনে হল না।

তারা পরস্পরে মুখ চাওযাচায়ি করলো।

তারপর গাড়ির চালকই মনের বল করে বলল, বাবু আপনি?

সাহসতো একটু লাগবেই। দেবনাথের অভিজাত চেহারা, দেবনাথের মিহি কোঁচানো ধুতি আরো মিহি গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী, দু'আঙুলে দুটো ঝকঝকে আংটি, মূল্যবান জুতো, এ সমস্তই দেবনাথকে তাদের কাছ থেকে যোজন দূরে রেখেছে। ....তবু বেরোবার সময় বেণু হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিয়ে তুলে রেখে দিয়েছিল 'দিনকাল ভালো নয়' বলে। ভীড়ের মধ্যে কখন কে টুক্ করে কেটে নেবে টেরও পাবেন না।

দিনকাল ভালোর কালেও চিরকালই এই মেলাতলায় মেয়েদের গলা থেকে হার সাফাই হয়ে থাকে। কে কত টের পায়? বাড়ি ফিরে দেখে হার হাওয়া। অবশ্য কান থেকে ইয়ারিং মাকড়ি ছিঁড়ে নিলে হৈ চৈ ওঠে কান্নার রোল ওঠে, তা বলে কবে আর মানুষ এতো সাবধান হতে যাচ্ছে লোকসমাজেই যদি না দেখাতে পেল, গহণার দরকারটা কী?

তবে হ্যাঁ আজকাল 'দিনকাল' সম্পর্কে মানুষ সচেতন হচ্ছে, সাবধান হচ্ছে। বেণু তাই বাবার দামী ঘড়িটায় সাবধান হয়েছিল। কিন্তু তাতে এমন কিছু তফাৎ হলোনা। দামী সস্তা এতো না বুঝুক, হাতে ঘড়ি বাঁধা শার্ট পেন্টুল পরা 'বাবু' দেখতে বরং এদের চোখ অভ্যস্ত।

সরকারি লোক, ঠিকেদার, জরিপবাবু, ইত্যাদি করে আরো যাদের সব দেখতে পায় সকলের মতো ওই একই সাজ! শার্ট পেন্টুল। হাতে

ঘড়িও। নিজেদের ঘরের ছেলেগুলোও তো এই সাজই ধরেছে। হাফ পেণ্টুল থেকে ফুল পেণ্টুল। ফ্যাসানের খাতিরে নয়, ধুতির খরচ জোগানো সম্ভব নয় বলে। ধুতিটা মস্ত বিলাসিতা।

আর দেবনাথের পরণে যা বেশভুষা, সে তো 'রাজাবাবু'দের মত। বয়স্ক জনেদের বাল্য যৌবনের স্মৃতিতে যা আঁকা আছে।

তাই এমন সমীহ ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন বাবু আপনি ?'

দেবনাথ হেসে বললেন, হ্যাঁ আমিই তো। গাড়িতে একটু জায়গা হবে তো ভাই ?

এই গো-গাড়িতে।

ওরা আবার মুখ চাওয়াচায়ি করল। একজন মুখপাত্র হয়ে বলল. আসছেন কোতা থেকে।

দেবনাথ পিছন পানে একবার চোখ ফেলে বললেন ওই তো মেলাতলা থেকে।

উত্তরটা সঠিক উত্তর নয়। লোকটা কী ধরণের তা বোঝা যাবে না। ····তবে এদের আর ভয়টা কী ? সঙ্গে তো কাণা কড়াও নেই। যা কিছু এনেছিল, মেলার বাজারে খেয়ে আর কিছু সওদা করেই ফুঁকে গেছে। আর সওদাগুলোও এমন, কেড়ে নেবার যোগ্য নয় !

কে আর মাতুর খুরশী-পীড়ি. কাঠের কেঠকো, ডালে দেবার কাঠি, রবারের চটি লুট করতে বসবে।

তা' মুখপাত্র গ্রাম্য হলেও বোকা নয়। ও প্রশ্নটা বাদ দিয়ে বলল, তা যাবেন কোথায় ?

এই তোমরা যেখানে যাবে, সেখানেই।

বেশ প্রসন্ন দেখালো দেবনাথের মুখ।

মুখপাত্র সঙ্গে সঙ্গেই দেবনাথের অলক্ষ্যে একবার নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে দিল ····এইখানে গণ্ডগোল।

যেচে বিপদ ঘাড়ে নেবে কে ?

সঙ্গে না আছে বাক্স বিছানা না আছে আর কিছু, 'তোমরা যেখানে যাচ্ছো বলে' সঙ্গ নিলেই তো হলনা। কে ওর ম্যাও সামলাবে? খাবে কি? থাকবে কোথায়?

মাথা নেড়ে বলল, না বাবু, জাগা নাই। আমরা গরীব গুরবো লোক, গুড়ের নাগরীঠাশা হয়ে কোনো প্রেকারে আসতেচি যেতেচি—আপনি পারবেন না।

দেবনাথ উৎসাহের গলায় বললেন, কেন পারবোনা ভাই? আমি তো তোমাদেরই একজন।

ওটা তো বাবু কতার কতা! আমরা চাষিবাসী নোক। আপনি রাজা রাজড়া নোক।

রাজা রাজড়া।

দেবনাথ হা হা করে হেসে ওঠেন। অ্যাঁ! রাজা রাজড়া! ভাল বলেছে।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন, বুঝেছি। ওই সব বলে আমায় তাড়াতে চাইছ। ঠিক আছে আমি হেঁটে যাচ্ছি।

সত্যিই হাঁটতে শুরু করেন।

এরা দুঃখসূচক একটা শব্দ করে বলে, আহা এমন রাজার মতন মানুষটার মাতাটা খারাপ গো!

দলের মধ্যে থেকে তারাপদর বৌ অহল্যা হঠাৎ ঝাঁজের সঙ্গে বলে ওঠে, তো রাজার মতন মানুষডারে তো ভিকিরি নাকারির তুল্যি ছ্যানোস্তা করে খেদিয়ে ছ্যাওয়া হলো! সকল মিলে একটু চেপে চুপে বোস করলে এ্যাকডা মানুষের জাগা হতনি?

তারাপদ রেগে উঠে বলল, তুই থামতো সর্দারণী। তুই বড় বুজিস না? শুধু গাড়িতে ঠাঁই দেলে হবে? বলি 'তেঁতুলগাছি' কি বাবুর শোউর বাড়ি? সেখানে পৌঁচে দেলেই তারা জামাই আদরে ঘরে তুলে নেবে? দেখছিস একটা পাগল মনিষ্যি—

দ্বিতীয় পক্ষের বৌ অহল্যাকে তারাপদ সোহাগও যত করে, খিঁচুনিও তত দেয়। দেয় অহল্যার সকল কথায় আগ বাড়িয়ে কথা কওয়ার অব্যেসে। আরো তো এতগুলো মেয়ে ছেলে রয়েচে কেউ তো কিছু কয় নাই।

অহল্যাও অবশ্য ছেড়ে কথা কয় না।

ঝাঁজালো গলাতেই বলে, পাগল মনিষ্যি বলেই আরো চিন্তা।

চিন্তা। অঁ্যা চিন্তা।

তারাপদ রেগে মেগে বলে এতো গুলান লোকের মধ্যে কারুর চিন্তা হল না, তোর কেন একটা পতের নোকের জন্যি চিন্তা। অ্যাঁ?

অহল্যা মুখ বাড়িয়ে দেবনাথের অপস্রিয়মান। দেহটার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলে, শরীরে মনিষ্যির রক্ত থাকলেই চিন্তা।

অ্যাঁ কী বললি? এই এতো গুলান লোকের শরীলে মনিষ্যির রক্ত নাই, শুধু তোর আছে?

অহল্যা মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে।

গাড়ি চলতে শুরু করে।

দু'দিন ধরে তারাপদর দোজপক্ষের বৌয়ের সঙ্গে এই দাম্পত্যলীলা দেখে দেখে বাকি জনেদের গা সওয়া হয়ে গেছে। সবাই কৌতুকই অনুভব করেছে। এখন 'মনিষ্যির রক্তের' প্রসঙ্গ তোলায় গায়ে লাগে।

হারাণ মণ্ডল বেজার গলায় বলল, কতাটা তোমার ঠিক বলা হয় নাই বৌমা। দুম করে একটা কাজ করলেই তো হয় না। অগ্‌রোপচ্চাৎ বিবেচনা করতে হবে না? ওই বাবু নোককে আমরা রাখবো কোথায়? খেতে দেব কী? সেটা বল? হ্যাঁ আমাদের ঘরের কেউ হতো মনিষ্যির রক্ত গায়ে আছে কি না আছে দেকাতাম।

বিহঙ্গ দলুইয়ের পিসি তার সওদা সামলাচ্ছিল এতোক্ষণ, কিছু আবোল তাবোল কিনে ফেলেছে সংসারের জন্যে, যে সব অন্যের গায়ে না ধাক্কা দেয়। নিজের সংসার নয়, ভাইপো-বৌ তেমন পাত্তাও দেয়না, তবু মনসা

সংসার গুছিয়ে মরে। সব গুছিয়ে রেখে এতোক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, দেকে মনে হলো মানুষটা যেন হেসো হেসো। মন নিচ্ছে কেউ গুণতুক করতে গে উদাস করে দেচে।

বিহঙ্গর বৌ আসেনি, কোলে কচি, বিহঙ্গ অবিরত পিসির হ্যাঁপা সামলেছে, তাই মেজাজ খারাপ। প্রায় খিঁচিয়ে বলে উঠল, তুই দেকলি আর সব বিত্তান্ত বুজে নিলি ?

মনসা নীচের ঠোঁটটা টেনে দাঁতের কোলে দোক্তা ঠুশতে ঠুশতে আড়মাদলা উচ্চারণেই বলল, বোজবোনা ক্যানো ? আজ এইচি পিথিমিতে ? কতো দেখলাম, কতো শোনলাম। কালো নন্দর পরিবার বিষয় সম্পোত্তির নোবে শোউরকে তুকতাক করে পাগল করে ছায় নাই ? দশে ধম্মে জানে।

হারাণ মণ্ডল গায়ে পড়া হয়ে বলে ওঠে, ওটা ভুল কতা পিসি, নন্দর বাপের অতিরিক্তো গ্যাঁজা টেনে টেনে বেম্মতালুতে রক্তো চড়ে গেছল।

তোমায় বলেচে। নন্দর পরিবার তোমার পরিবারের বুনঝি সমপোক্কো, তাই তুমি তার দোষ ঢাকতেছো। ....শেতলাতলার সুবুদ্দি ঠাকুর খড়ি গুণে বলে নাই ?

হারাণ মণ্ডলের পরিবারের খোঁটায় হারাণ বিরক্ত গলায় বলে, কী বলেছেলো সুবুদ্দি ঠাকুর ?

যা বলবার বলেছেলো। বলছেলো ঘরের লোক তুকতাক করেছে। তো আর কে আচে ঘরে ? বেটা বেটার বৌ আর কচি নাতনীডা ছাড়া ?

কথায় কথায় কলহ বাধে। হারাণের বৌও যোগ দেয়। আবার থামেও।

হারাণ মণ্ডল মুখ ফিরিয়ে বিড়ি টানতে টানতে বলে, সাদে কি আর শাস্তোরে বলেছে 'পথি নারী-বিসজ্জিতা।' মেয়েছেলে সঙ্গে থাকলিই কোঁদল।

'বিসজ্জিতা' না 'বিবজ্জিতা' খুড়ো ? ...বিহঙ্গ বলে ওঠে 'বিসজ্জিতা'

মানে 'বিসজন' দাওয়া না ?

ও তুই একই কতা বিহঙ্গ! যেমন ভাতকে ভাতও বলিস, আবার—অন্নোও বলিস।

তো সে যাই হোক, মেয়েছেলে সঙ্গে থাকা ঝকমারি বৈকি। তারাপদ রাগ রাগ গলায় বলে, কেবল অসন্তোষ অপছন্দো আর কূট কচানে কতা।

মনসা আবার যোগ দেয়, তুই থামতো পদো, আর মুক নাড়িসনে। মেয়েছেলে যদি এতোই মন্দো, তো একটাকে চিলুতে তুলে দে দুদিন না যেতেই আবার বে'র পীঁড়েয় বোস করতে গেলি ক্যানো ?

তারাপদ আড়চোখে একবার অহল্যার থমথমে পাশ ফেরা মুখটার দিকে তাকিয়ে বলে দুটো ভাত জলের জন্যি আর ক্যানো ?

তোর পেথম পক্ষো মরতে, ছমাস এই মনসাপিসি তোর ভাত জল করে দে আসে নাই পদো ? বেইমানের মতো কতা বলিস তো বল করে নাই।

তা কেন বলতে বসবো ?

তারাপদর গলা মিনমিনে।

তো তাই বল! অ্যাকদিনের জন্যি বলেচি, পারচিনা পারবোনা ? অ্যাকদিনের জন্যি অগগেরাহ্যি করে দিয়েচি ?

শশী কামার বেশী কথা বলে না, এতোক্ষণে মুখ খোলে। একটু রহস্যের হাসি হেসে বলে, পিসির তো বয়সের গাচ পাতোর নাই। অ্যাতো জ্ঞানমান বুদ্দিমান হয়ে এই কতা বলতেচে ? শুদু ভাত জল হলিই সব হয়ে গ্যালো ?

মনসা রেগে বলে, আমি বলি নাই। যে বলেচে তাকে শুদো।

এর উত্তরে তারাপদ কী বলতো কে জানে, অহল্যা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ওই ওই ডোবার ওধারে দে সেই বাবুটা যেতেচে।

তারাপদ বলে ওঠে, যেতেচে তো যেতেচে। তোর অ্যাতো উল্লাসের কী আচে ?

অহল্যা সে প্রশ্নে দৃকপাত না করে বলে, ও পিসি, গাড়োয়ান খুড়োরে কও, ওনারে ডেকে এনে গাড়িতে তুলে নিতে। এইতো এটুবাদ আঁদার হয়ে যাবে। আষাঢ়ান্তো বেলা, তাই অ্যাখনো চিকচিক হানচে, আঁদার হয়ে গেলে বেভুল মানুষডা কোতায় যেতে কোথায় পা ফেলবে। বেপদ ঘটবে।

তারাপদর গা জ্বালা করে ওঠে।

তারাপদ বেজার গলার মধ্যে নিমপাতার রস ঢেলে বলে, দেশরাজ্যি জুড়ে হরদম তো বেপদ ঘটচে, ওনার জন্যি তোর অত্যো গা করকরানি ক্যানো শুনি? সোন্দর বলে বুজি?

অহল্যা গাড়ির ছইয়ের মধ্যে দাঁড়াতে পারেনা, তবু এমন ফুঁসে ওঠে, মনে হয় বুঝি কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে উঠল। তা কোমর বাঁধা গলাতেই বলল, শুনলে পিসি? শুনলে আপনারা? অ্যাতো গুলান মান্যমান মানষের সামনে কী ছোট্‌নোকের মতন কতা। মানুষডা আমার বাপের বইসী—

কথাটা অবশ্য মিথ্যা নয়।

অহল্যার বয়স মেরে কেটে চব্বিশ।

তা সত্বেও কেউই খুব একটা সায় দেয় না অহল্যার কথায়। কারণ বাবুটাকে ফের ডেকে এনে গাড়িতে তোলার প্রস্তাবটা কারুরই মনঃপুত হয়নি।

তারাপদ জনমতের হাওয়া আন্দাজ করে, সাহসে ভর দিয়ে বলে, তবে যা। নিজেই নেবে গে' বাপ বলে, গলা ধরে ঝুলে ডেকে আন।

ভিতরের সব তিক্ততা যেন তারাপদর এই কথা কটার মধ্যে দিয়ে ঝরে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে অহল্যা চেঁচিয়ে উঠে বলে, ঠিক আচে। তাই হবে। আমার এই শোউরবাড়ির দেশে যদি বাপের গলা ধরে ঝোলা নেয়ম থাকে, তাই ঝোলবো। খুড়োমশায় গাড়িডা অ্যাকবার থামান তো।

চোকের সামনে অ্যাকটা ভদ্দর মানুষ বেঘোরে প্রাণডা হারাবে, জেনে বুজে থির থাকতে পারবনি।…এই আপনারা সবাই সাক্ষী, ওনারে আমি 'বাপ' ডেকেই ঘরে তুলবো। এরপর যোদি ওই ছোটোনোকটা অ্যাকটা মন্দ কতা মুকে আনে, অহল্যার সোয়ামীর ঘরের বাস উটবে। হ্যাঁ তা বলে রাকচি।

হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ির সামনের দিকে চলে আসছিল নেমে পড়তে, গাড়োয়ান বদন ঘোষ শান্ত গলায় বলল, থাক বৌমা ঠাকরোণ, আমি যেতেছি।

গরুর গাড়ি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে দেবনাথ হেঁটেই চলেছিলেন। কেন হাঁটছেন, কোন লক্ষ্যে, এ হাঁটার শেষটা কী, কিছুই ভাবছেন না। শুধু এটা মনে হচ্ছে সন্ধ্যে হয়ে আসছে, পথে তো আলোর চিহ্ন নেই, তা হলে পথটা দেখতে পাবেন কীকরে? যেন পথটা দেখতে পাওয়া আর সেইটা ধরে ধরে এগিয়ে যাওয়া এইটাই একমাত্র উদ্দেশ্য দেবনাথ রায় নামের মানুষটার।

অথচ পড়ন্ত বেলার সোনালী আলোর সৌন্দর্যে মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়েছেন। এ গাছটাকে কী বলে? পাখিটার নাম কী? প্রত্যেকটি গাছের পাতা কী করে এমন আলাদা হয়? আবার কখনো কখনো মনে হচ্ছে, এই পায়ে চলা মেঠো পথটা দিয়ে আমি কি আগে হেঁটেছি।

॥ ৭ ॥

তোমাদের সঙ্গে তাহলে আবার দেখা হল ?

হাসিতে উজ্জ্বল মুখ দেবনাথ সকলের মুখের দিকে তাকালেন, অ্যাঁ সেই সব চেনা মানুষরা।

এরাই যে গাড়িতে জায়গা নেই বলে ভাগিয়ে দিয়েছিল, সে কথা মনে থাকে না দেবনাথের। কোঁচা সামলে গুছিয়ে বসে বলেন, অন্ধকারে গাড়ি চালাও কী করে ভাই ?

আমাদের চোখে মানিক জ্বলে দাদু !

চোখে মানিক জ্বলে ? বাঃ তুমি তো বেশ মজার কথা বলতে পারো।

অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে।

চারিদিকে গাছপালা ঝোপঝাড়, তার মধ্য দিয়েই গুরুর গাড়ি তার আদিমতম চেহারা, আর আদিমতম শব্দ নিয়ে বহুকষ্টে এগিয়ে চলেছে। লোভে পড়ে এতগুলো লোক নিয়েছে, বলদদুটো যেন আর টেনে নিয়ে চলতে পারছেনা। তাই প্রতি মুহূর্তেই শব্দ উঠছে ক্যাঁচ-কোঁচ। তার সঙ্গে বলদের গলায় বাঁধা ঘণ্টার একটানা টুংটাং ধ্বনি, আর মাঝে মাঝেই চালকের হাতের ছপ্‌টির শব্দের সঙ্গে তার মুখনিঃসৃত একটা বিশেষ শব্দ। এ রকম শব্দ করতে শুধু ওরাই পারে।

আরোহীদের মধ্যে আর কারো কোনো সাড়া নেই সকলেই ঢুলছে, নাক ডাকছে। একটু আগে যে জায়গাটাকে কলহক্ষেত্র করে তুলে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সবাই, তা আর বোঝা যাচ্ছে না।

নিজেকে হারিয়ে ফেলা দেবনাথ যেন অবাক অবাক চোখে শুক্লা-তৃতীয়ার ক্ষীণ জ্যোৎস্নার আলোর ওড়নায় ঢাকা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন।

এতোক্ষণ তো খুব ভালো লাগছিল।

এদের সঙ্গে গাড়িতে উঠে পড়ে মনে হচ্ছিল সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। একটা মেয়ে 'বাবা বাবা' করে কথা বলছে। সবটাই তো ভরাট। কিন্তু এখন এই স্তব্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে, কী যেন হারিয়ে ফেলার বেদনা অনুভব করছেন।

কী হারিয়ে ফেলেছি আমি ?

কোথায় ? কখন ?

অনেক রাত্রে গাড়ি থেকে নেমে যে যার আস্তানায় চলে গেল নিজ নিজ পরিবার জন নিয়ে, শুধু তারাপদ নামক একটা হতভাগ্যের সঙ্গে এক রাজসিক বিপদ।

বলি, নে তো এলি, ওনাকে শুতে দিবি কোতা !

অহল্যা বলল, সে তোমার ভাবতি হবেনি। তুমি শুধু পাতকো থেকে এট্টু জল তুলে ওনার হাত মুক ধুতে দ্যাও। মনে ভাববে বাড়িতে তোমার শোউর এয়েচে, তারে স্যাবা যত্নের দায়িত্বো, শুধু আমারই না, তোমারও।

তারাপদ হঠাৎ যেন কেমন কোণঠাশা হয়ে যায়। আস্তে গিয়ে কুয়োয় ঘড়া নামায়। তারাপদর অবস্থা পাড়ার মধ্যে ভাল। গ্রামে ক'জনার উঠোনে পাতকুয়া আছে ? তারাপদর বাপই অবশ্যই এই সুবিধে করে রেখে গেছে। তবে বাসনমাজা কাপড়কাচা, এসব অহল্যা পুকুরে গিয়েই করে। পাতকোর জল টেনে টেনে তোলার ঝামেলা নেই ? যা তোলে তারাপদ। রান্না খাওয়ার জন্যে, স্নানের জন্যে।

জল তোলার সময় অহল্যা একটা কেরোসিন কুপী নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, বাতাসে তার শিখাটা ঝটাপট করছে।

দেবনাথ হাসি-হাসি মুখে বলেন, ওই দড়িটা আমায় দাওনা। আমি একটু জল তুলি।

তারাপদ উড়িয়ে দিল, কী যে বলেন বাবু। আপনি তুলবে জল ?

দেবনাথ জেদের গলায় বললেন কেন ? কী হয়েছে ?

আপনাদের হল গে কলমধরা হাত, ওতে কি আর ঘড়া দড়া ধরতে পারেন ?

পারবনা মানে ? আমি তো এ সব কত করেছি।

তারাপদ অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

কবে আবার এসব করতে গেলে আপনি ? কোতায় ? কোন গাঁয়ে ?

দেবনাথ থতমত খেলেন।

কবে, কখন্ কোন গাঁয়ে ? তা তো মনে পড়ছে না। অথচ বেশ মনে পড়ছে। ওই ভাবে মাথা নীচু করে দড়ি টেনে টেনে জল তুলে আনছেন তিনি।

একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, তোমার নাম কী ?

আজ্ঞে তারাপদ।

ওঃ! তা তুমি একথা কেন বললে বলতো, আমার হচ্ছে কলমধরা হাত !

চ্যাহারা দেখেই মালুম। কাগচ কলম নে চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করার চ্যাহারা।

কাগজ কলম। চেয়ার টেবিল অফিস।

দেবনাথের মনে হয় তিনি কি হঠাৎ পূর্বজন্মের স্মৃতির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছেন ?

নেন বাবু, হাত মুখ ধুয়ে নেন।

দেবনাথ কৌতুহলী হয়ে বলেন, আচ্ছা চেহারা দেখে তুমি তো আমার আগের জন্মের কথা বলতে পারলে, আমার নামটা কী বলতে পারো ?

আজ্ঞে তা' কেমন করে পারবো ? আপনার মুখেই শুনি। আমার নাম তো জানলেন, অ্যাখোন আপনার নামডা জানি।

আমার নাম ? আমার নাম····দেবনাথ উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, মুস্কিলে ফেললে তো ! নামটা হঠাৎ মনে পড়ছেনা কেন বলতো ?

তারাপদ গুম হয়ে যায়।

সত্যি মনে আসছেনা, না কি ভেক্ তা' কে জানে। হারামজাদি অহল্যা 'বাপ' ডেকে সোহাগে উৎলে উঠে ঘরে এনে পুরলো। পুলিশের চর কি না তাই বা কে বলবে। ছদ্মোনাম খুঁজতে গে গুলিয়ে ফেলচে। মাতাখারাপ না হাতী, সব ছল।

তারপর আর একটি কুটিল সন্দেহ মনের মধ্যে পাক দিতে থাকে তারাপদর। বেহায়া মেয়েছেলেকে বিশ্বাস নেই। 'বাপ' ডাকা, লোকের মুক বন্দো করা। এককথা তো বলবার জো থাকবে না।

হয় আগের ভাব ভালবাসা, নচেৎ লোকটা পুলিশের চরই। সত্যি, তারাপদর মত এমন বিপদে এতল্লাটে আর কে কবে পড়েছে? ব্যাপারটা ঘটে গেল যেন একটা অলৌকিক মত। তারাপদ, শশী, হারাণ, বলাই, এবং আরো সবাই, এরা হল গিয়ে চাষীবাসী গেরস্ত। 'নুন আনতে পান্তো ফুরোয়, পান্তো খেতে নুন।'

ছ্যাঁচাবেড়ার ঘর থেকে যাদের মাটির দেওয়াল ওঠে, তাদেরকেই এরা 'অবোস্তাপন্নো' বলে।

তারাপদর বাপ অবোস্তাপন্নো ছিল, তারাপদ তার উপসত্ব ভোগ করছে। তারাপদর তিন তিনখানা ঘর, মাটির দেওয়াল মাটিরমেঝে, অহল্যার গতরের গুণে, পালিশ করা।

তাছাড়া যেটা তারাপদর বাপ হারাপদর শয়ন ঘর ছিল, এবং এখনো তারাপদর কেমন একটা সমীহের বশে সে ঘরে বৌ নিয়ে শুতে পারেনা, বলে, 'কাজ নাই' ভাল ঘরে, বাবার চৌকীতেই তো তা'লে শয়ন করতে হবে', সে ঘরে ভাল কাঠের তক্তপোষ, তাতে শীতল পাটি বিছোনো, দেয়ালে দেয়ালে ঠাকুর দেবতার ছবি। ঘরে দু দুটো জানালা, ঘরে বসেই ছুঁচে সুতো পরানো যায়।

বাকি দুখানা ঘরে হাত পা মেলে বাস করে তারাপদ। বৌ আর নিজে বৈ তো নয়? দু দুবার বিয়ে করেও, তারাপদর ঘরে কাঁথা কানি ঝিনুক

কাজললতার প্রবেশ ঘটেনি।

জমি জমা আছে, ইদানিং আবার অন্য একটা আয়ের পথ হয়েছে, কাজেই তারাপদ গ্রামের মধ্যে বিশিষ্ট একজনই বলা যায়।

আয়ের পথ শশীরও আছে, অথবা ঠিক বললে শশীরই আছে, শশীই পথিকৃৎ। কিন্তু শশীর ঘর, ঘর না শ্মশান। কেউ কোথাও নেই শশীর। ····এবং বাউণ্ডুলে শশী সদাই পুলিশের ভয়ে তটস্থ বলে ঘরের কোনো ছিরি ফেরাবার চেষ্টাও করেনা। দুটো ভাঙ্গা ফুটো পেতল কাঁসা আর চারটি মাটির বাসন নিয়ে শশীর কারবার।

তবু তারাপদ বেশীর ভাগ সময় ওই শশীর ঘরেই পড়ে থাকে। ওর জমি জমা দেখে হারাণ। অবশ্য নিজের লাভ রেখেই দেখে।

তারাপদর আগের বৌটা যে পরম গুরুর হাতেই 'নিহত' হয়ে স্বর্গে গেছে, সে কথা গ্রামের সবাই জানে, তবে তা' নিয়ে হৈ চৈ করতে যায়নি কেউ। নেশার ঝোঁকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল বৈ আর কিছু করেনি, এতে যদি বৌ পূর্ব্বজন্মের শত্রুতা সাধতে মরে যায়, তারাপদ কী করবে?

অহল্যাকে ঘরে এনে পর্যন্ত তারাপদ খুব সমঝে থাকে। একবার রেহাই পেয়েছে, বারবার কী পাবে? একেই তো শশীর সূত্রে সর্বদাই পুলিশের ছায়া দেখছে।

হঠাৎ দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার একটা লোককে 'বাপ' বলে ডেকে ঘরে এনে তুলল, এ যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার। 'লোক' মানে কি যে সে লোক? 'বাবু ভদ্দরলোক।' যেমন চেহারা তেমনি সাজসেজে।

আবার কি না 'মাথা পাগল' সাজছে। সাজছেই নির্ঘাৎ। তারাপদ বলে, নেহাৎ পাগলা ছাগলাদেরও আপন নামতা স্মরণে থাকে। বুজলি অহোল্যা। আমার সন্দ পুলিশের চর। নিখ্‌ঘাৎ তাই। ····'নাম মনে নাই।' চিরকাল পাতকো থেকে জল তুলচি।' হুঁঃ। তারাপদো ঘাস খায়।

॥ ৮ ॥

অহল্যা ভুরু কুঁচকে বলল, তোর ঘরে পুলিশ আসবে ভয় ক্যানো ? তাহলে লুকিয়ে চুরি ডাকাত্তি করিস বল ?

বল, আরো পাড়া মাৎ করে চেঁচিয়ে বল। বলি শশীর ঘরে চোলাই হয় না ?

তো শশীর ঘরে পুলিশ ঢুকুক। তোর ঘর ক্যানো ?

আমি তার সায়ায্য করি।

তাই বা করতে যাস ক্যানো ? কাজডা য্যাখোন বেআইনী !

ওঃ। ভারী আমার বিদ্যেবতী পরিবার গো, আইন দেখাতে এলেন ! বন্দু মানুষ, তার সায়ায্য করবোনা ? শশীর তো ওটাই পেশা। ওতেই ওর ভাত। কামারের কাজে কতো হয় ? তবে বলি তুই বা কোন আইনে অ্যাকটা অচেনা অজানা ব্যাটাছেলেকে ঘরে তুললি ? 'বাপ' ডাকলেই সাত খুন মাপ কেমন ?

ফের ? ফের অসব্য কতা ?

অহল্যা নতুন কেনা কাঠের বেলুনটা হাতে তুলে নিয়ে বলে, ফের এমন কতা মুকে আনলে এই কাট কপালে ঠুকে রক্তগঙ্গা হবো তা, কয়ে রাকচি।

তারাপদ চুপসে যায়।

ভাবছিল ওকেই বুঝি মারতে আসছে।

তাহলে একটা চেঁচামেচির পথ থাকতো। পাড়া পড়শী অহল্যার মতি গতি টের পেতো। নিজে রক্তগঙ্গা হতে চায়। ও বাবা ! লোকে সেটা বিশ্বাস করবে ? ভাববে হাতছাড়া তারাপদ আগের বৌটাকে যেমন—

ঢোক গিলে বলল, আমার অদেষ্ট ! তাই তোর মতন একটা খাণ্ডারণী ছাড়া জুটলোনা।

অদেষ্টই বটে !

দু দুটো রাত মেলাতলার আনাচে কানাচে কেটেছে, আজ কোথায় তারাপদ আপন ঘরে, মন মজিয়ে সুখ আয়েস করে কাটাবে, তা নয়, মহিষমর্দিণী নে রাত্তির বাস।

আবার এখন থেকেই সত্যিবদ্ধ করে রাখছে রাতে দুটো মুড়ি খাইয়ে রেকেচি আমার বাপকে। সক্কাল বেলা গোবিন্দর দোকান থেকে জেলাপি আর অসমুণ্ডি এনে দিতে হবে, তা বলে রাকচি। ওনার সামনে তকরার করবি না।

সাতপুরুষের বাপরে আমার।

॥ ৯ ॥

কোথায় আছেন, কোথায় শুয়েছেন বুঝতে পারেননা দেবনাথ। চশমা-টাই বা মাথার কাছের টেবিলে কই ?

উঠে পড়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে কপালে ঠোক্কর খেলেন। উঃ। করে কপালে হাত ঘসতে ঘসতে অসহায় গলায় বললেন, বেণু! বেণু! আমার চশমাটা কই ?

মাথা টোকা দেখেই ছুটে এসেছে অহল্যা।

লাগলো তো ? জল দিই দাঁড়ান।

ছুটে একটা জলের ঘটি নিয়ে আসে।

দেবনাথ বলেন, জল লাগবেনা। চশমাটা খুঁজে পাচ্ছিনা।

চশমা তো আপনি রাতে জানলার ধারে রাখলে বাবা!

ছুটে ঘরে ঢুকে এনে দেয় অহল্যা চশমাটা।

দেবনাথ সেটা চোখে লাগিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমাদের বাথরুমটা কোনদিকে বলতো ? আর আমার টুথপেস্ট টুথব্রাশই বা কই ?

ওসব তো আপনি কিছু আনো নাই বাবা! সঙ্গের বাকসো বিছানা কি রেলগাড়িতে হাইরে গেছে ?

হারিয়ে ?

দেবনাথ থমকে বলেন, কী হারিয়ে গেছে বললে ?

এই আপনার সঙ্গের জিনিস পত্তর। হাতে তো কিছু ছেলনা।

দেবনাথ ওদের একটা ভাঙা জলচৌকির ওপর বসে পড়ে, অসহায় ভাবে বলেন, তাই হবে। তাই হবে। আমার বোধহয় কত কী হারিয়ে গেছে।

দেবনাথ রায় নামের লোকটাতো তাঁর 'কত কী' যেন হারিয়ে গেছে ভেবে অদ্ভুত একটা শূন্যতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে ব্যাকুল হচ্ছেন, যেন

একটা সাঁতার না জানা মানুষ জলের মধ্যে পড়ে গেছে। মাথাটা তোলবার জন্যে আকুলি বিকুলি, অথচ কিছুতেই তুলতে পারছে না। অথচ এদিকে তাঁর সেই ছারিয়ে ফেলা জীবনের অংশটা হাহাকার করে বেড়াচ্ছে তাঁকে হারিয়ে ফেলে।

মাহেশের রমেন ডাক্তারের ছেলে শ্যামল যখন পরদিন কলকাতা থেকে ফিরে এসে ভগ্নদূতের মত খবর দিল 'ওখানে যাননি—'

তখন বেণু এযাবৎ যা না করেছে, তাই করে বসল! শ্বশুর শাশুড়ীর কান না বাঁচিয়ে বরকে যাচ্ছে তাই করে তারপর হাউহাউ করে কাঁদতে বসলো। অভিযোগের কারণ···গতরাত্রেই কেন শ্যামল কলকাতায় ছুটে যায়নি, কেন বেণুর ভাইকে এতোবড় দুর্ঘটনার কথাটা জানায়নি, কালকেই তোড়জোড় করলে হয়তো, কোনো হদিস পাওয়া যেত।

জলজ্যান্ত আস্ত একটা মানুষ হারিয়ে গেল, আর তুমি নিশ্চিন্দিচিত্তে বসে থাকলে। 'কাল যখন কলকাতায় যাবো, নেবো খোঁজ।' বলে বলতে যাচ্ছিল, নিজের বাবা হলে পারতে এমন নিশ্চিন্দি হয়ে থাকতে? ···বললনা সামলে নিল। আর সেটা সামলাতে গিয়েই কান্নাটাকে আর সামলে নিতে পারলো না।

অতএব শ্যামলকেও মুখে এসে পড়া একটা কথা সামলে নিতে হলো, নইলে প্রায় তো বলেই ফেলেছিল জলজ্যান্ত আস্ত সুস্থ একটা মানুষ, না ভাঙা চোরা দোমড়ানো মোচড়ানো একটা লাশ?

এই সবই তো চিন্তায় আসে।

হয়তো কোথায় কোনোভাবে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে মারাপড়ে লোক লোচনের অন্তরালে পড়ে আছে!.... হয়তো কোনো দুবৃত্ত ঘড়ি, আংটি টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে খুন করে কোথায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বেণুর ওই লজ্জাহীনতাটা, কেউ তেমন নিন্দনীয়

বলে ধরলোনা, বরং বৌটার প্রতি করুণার বশে, আড়ালে চুপিচুপি ওই সব আশঙ্কার কথা আলোচনা করছে। সামনে বলছে না।

একবার অবশ্য বেণুর শাশুড়ী মুখ ফস্কে বলে ফেলেছিলেন, এই 'দিনকাল'! আর আমার বেহাই মশাই কিনা হীরে পান্নার আংটি পরে রথের মেলায় বেড়াতে গেলেন! পকেটেও হয়তো বেশ কিছু টাকা পয়সা ছিল! কে জানে কোন 'খুনে'র হাতে পড়লেন কিনা!

তবে কর্তার ভ্রুকুটিতে তাড়াতাড়ি চুপকরে গেলেন।

তবুও বেণুর কান্না আরো বেড়ে গেল।

রমেন ডাক্তার বুদ্ধিমান ব্যক্তি, এবং মানুষের ব্যাধি নির্ণায়ক, কাজেই তিনি পাড়ার বখাটে ছেলে গুলোর চিন্তাধারাতেও অগ্রসর হলেন। বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে মেলাতলার পিছনের সেই নিষিদ্ধ এলাকা থেকেও খবর সংগ্রহ করতে ছাড়লেন না। যে ব্যক্তি বহুদিন পূর্বে বলতে গেলে পূর্ণ যৌবনেই মৃতদার হয়ে বসে আছেন, কে বলতে পারে তিনি অতি সঙ্গোপণে কোনো বদ অভ্যাসের দাসত্ব করে আসছেন কিনা। কিছু না হোক, পানাসক্তি থাকলেওতো জামাই বাড়িতে এসে দু'দিনেই হাঁপিয়ে ওঠা স্বাভাবিক।

কিন্তু না! রমেন ডাক্তারের এই গোপন গোয়েন্দাগিরি কোনো কাজে লাগলোনা।

কোনো অনিষ্টকারিণী কি মোহিনীমায়া বিস্তার করে লোকটাকে নিয়ে পালিয়ে গেল? এই ভেবে তাদের গুণতির হিসেব সংগ্রহ করলেন। সে হিসেবও পাওয়া যাচ্ছে।

ওই তাবু থেকে কোন মোহিনীই অদৃশ্য হয়ে যায়নি। সকলেরই নাম ঠিকানা লেখা আছে, আসতে এবং যেতে ছাড়পত্র লাগে।

বিশ্বস্ত লোকটাকে পাঠিয়ে পর্যন্ত ডাক্তার একটু আস্বস্ত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন, খুবসম্ভব ওখানেই মিলবে হদিস। হলোনা; মিললোনা। ওই ধরণের কোন সম্ভ্রান্ত চেহারার ব্যক্তিকে কেউ ও অঞ্চলের ধারে

কাছে দেখেনি দু'দিনের মধ্যে।

অতএব আকাশ পাতাল ভাবে।

পাড়ায় যারা এযুগেও ভূতটুতে নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী তারা তবু একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছে।

'ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে' আবার কী ?

কিন্তু যারা ভূত বিশ্বাসী নয় ?

অস্থিরতা তাদেরই বেশী।

তা' পাড়ার লোকেও অস্থির হচ্ছে বৈ কি ! এতো আর কলকাতা শহর নয় যে, পাশের বাড়িতে কী ঘটছে না ঘটছে তা' নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। একেই 'মাহেশ' একটা ছোট্ট জায়গা, তার উপর আবার ডাক্তারের - বেয়াইয়ের ব্যাপার। পাড়ার সবাইতো আজ ওই প্রসঙ্গ নিয়েই অধিবেশণ বসাচ্ছে। আর শেষ অবধি লোকটাকে আর জীবিত বলে ভাবতে পারছে না। একটা কোন সিদ্ধান্তে তো আসতে হবে ? হয় মরেছে, নয় ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। আর নেহাৎই যদি ভালোর দিকে ভাবো, তো সন্নিসী হতেই চলে গেছে।

দেবনাথের ছেলে মুক্তিনাথ তো 'বাবা হারিয়ে গেছেন' শুনেই হেসে উঠে একটা সিদ্ধান্তে এসে পড়েছিল। বলেছিল আচ্ছা জামাইবাবু, আপনি কিনা গিন্নীর নির্দ্দেশে এমন একটা কাঁচাগল্প ডিষ্ট্রিবিউট করতে এলেন ? 'মেলাতলা থেকে বাবা নিখোঁজ। আশ্চর্য ! মাথায় এলোও বটে। বলুন না বাবা, দিদি পিতাঠাকুরকে আরো ক'দিন আটকে ফেলতে চায়। ব্যাপারটা এই তো ?

অবশ্য হাসিটা, মুছে যেতে বেশী দেরী হল না তার। শেষ অবধি কথাটা 'নির্ভেজাল সত্যি' শুনে থতমত খেল।

এও ভাবলো 'ভাগ্যিস শুধু বাবা একা !' বাবুয়াটাও যে 'হারায়নি সেটাই র'ক্ষে।' কিন্তু একটা খুব বড় ক্ষতি হয়নি বলেই যে অন্য একটা মেজ সেজ ক্ষতিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় এমন তো নয় ?

অতএব এরকম একটা আস্ত-সুস্থ মানুষ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে, যা যা করণীয় তা করা হতে থাকলো। ধারে কাছে কোনো সাধু সন্নেসীর ডেরা ছিল ?

তা' ছিল বৈ কি। মেলায় কী না থাকে ? তবে তারাতো সে ডেরায় রয়েছেই। তবে আর কার ভাঁওতায় ভুলে দেবনাথ রায়ের মত কেষ্ট বিষ্টু লোকটা চিমটে হাতে বেরিয়ে পড়বে ?

তবে যদি হঠাৎ 'বৈরাগ্যের' উদয় হয়ে থাকে। হতে পারে, লালাবাবুর হয়নি কি ? কিন্তু নিশ্চিত হবার উপায় কী ? পৃথিবীর এই বিশাল জনসমুদ্রের মাঝখানে, একটা মাত্র মানুষ কতটুকু ?

খোঁজ মেলেনা।

ক্রমশঃ হতাশা এসেযায়। হতাশার সঙ্গে রাগ অভিমান। বেশ না হয় লালাবাবুই হলে তুমি, তা' বলেকী যে, কোনো জায়গা থেকে একখানা পোষ্ট কার্ড ফেলে দেওয়া যায় না ?

তাতেই তোমার বৈরাগ্যের পতন হয়ে যাবে ?

কারুর প্রতি একটু মায়া এলনা তোমার ? অন্ততঃ বেণুর জন্যে ?

বেণুর হাহাকার ক্রমশঃই বাইরে থেকে গুটিয়ে এসে মনের গভীরে ক্ষয় ধরাচ্ছে। আর তার মধ্যে থেকেই স্বার্থপরের মত ভাবছে, বাবা গেলেন গেলেন, আমার বাড়ি থেকে যেতে গেলেন কেন ! নিজের বাড়ি থেকে যেতেন ! আমার বাড়িতে দু'দিনের জন্যে এসে, আমায় কেন দায়েরভাগী করলেন !

বাবা কলকাতা থেকে নিরুদ্দেশ হলে, আমার দুঃখু কষ্ট যা হতো হতো এমন লজ্জা হতোনা। শুধু লজ্জাই বা কেন ? লজ্জা গ্লানি, অপরাধী ভাব, আর পাঁচজনের কাছে মাথা হেঁট। নাঃ বেণুর সঙ্গে বাবা পূর্বজন্মের শত্রুর মতোই কাজ করলেন।

শ্বশুর বাড়িতে এ যাবৎকাল বেণুর 'বাবা' সম্পর্কে রীতিমত একটা গৌরব ছিল। বাবার উচ্চ পদ, উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রী, উচ্চ মান, এবং উচ্চ

মানের তত্ত্বতাবাস, এগুলো গৌরবের বৈ কি। তদুপরি বাবা কলকাতাই স্মার্ট এবং শৌখিন। বৌ মরা বেচারীর মত বিচ্ছিরি ছিরিছাঁদ নয়।

বেণুর সেই বাবা কিনা এই রকম একটা বিটকেল ব্যাপারের নায়ক হলো। নিরুদ্দিষ্টের কল্যাণে, বাবার নামে বিজ্ঞাপন ছাপাতে হলো?

ভেবে ভেবে আর কুল পায় না বেণু। পাচ্ছিলনা কেউই। তবে দেবনাথের ছেলে এবং জামাই ওই 'কুল'টা না পেয়ে ভাবনাটা ছেড়েই দিলো ক্রমশঃ। কিন্তু বেণু ছাড়তে পারেনা। সময় পেলেই বাবার প্রতিটি আচরণ স্মরণ করে করে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে।

আকাশ পাতাল!

য্যাকোন ত্যাকোন আপনি কী এতো আকাশ পাতাল ভাবো বাবা?

অহল্যা একটা বাটি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, অবশেষে প্রশ্নটা করে বসে, য্যাকোন ত্যাকোন আপনি কী এতো আকাশ পাতাল ভাবো বাবা?

উঠোনে পড়ে থাকা একটা ভাঙা নড়বড়ে জলচৌকীর উপর বসেছিলেন দেবনাথ, এই প্রশ্নের ধাক্কায় চমকে উঠে তাকালেন।

আহা সেই মেয়েটা!

যে মেয়েটা ঠাকুর মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ানোর মত ছলছলে নরম চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হাতে কি ওটা?

পুজোর ভোগ না কি?

বড় ভাল মেয়েটা! কিন্তু ভাল ভাবে জামা টামা পরেনা কেন? ওই ডাকাতের মত লোকটা কি ওকে বন্দিনী করে রেখেছে?

আস্তে বললেন কই কিছু ভাবিনা তো?

না, ভাবোনা বৈ কি! আমি সেই কখোন থে' দেঁইড়ে রইচি,

দেকতেই পাচ্ছোনা আপনি। য্যানো কোতায় মন, কোতায় মাতা!

দেবনাথ তাড়াতাড়ি বলেন, না! না! তা' কেন হবে? আমি ওই গাছের পাতাগুলো দেখছিলাম। তেতুল গাছ তো? কী সুন্দর পাতা-গুলো। বাতাস লেগে কেমন ঝিলমিল করছে। দেখেছ কখনো?

অহল্যা হেসে ফেলে বলে, জেবন ভোরই দেকচি। তেঁতুল পাতা, সজনে পাতা, হাওয়া বাতাস বইলেই ঝিলিক মারে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় না তোমার, কোথায় যেন কী সব হচ্ছে, তুমি জানতে পারছোনা, ওই পাতারা যেন সেইসব কথা চুপি চুপি বলা বলি করছে—

অহল্যা নিঃশ্বাস ফেলে দাওয়ার ধারে বসে পড়ে বলে, ছোটকালে ওসব আবোল তাবোল কতো মনে আসতো বাবা, মনে নিতো—রাতভোর তাইকে বোস করে থেকে দেকবো, ফুলগুলান কেমন করে ফোটে, গাচের চারা গুলান কেমন করে বাড়ে। তো শুনলে জোটি মারতে উটতো। আর অ্যাখোন তো কাজের দাপোট! কখোন বা গাচের পানে তাইকে বোসে থাকি!

দেবনাথ আস্তে বলেন, আহা!

তারপর আবার আরো আস্তে বলেন, চারিদিকে কতো শোভা সৌন্দর্য্য! দেখবার চোখ নেই।

চুপ করে যান।

বাবা। আপনার নেগে এই এট্টু ছ্যানা কাইটে এনিচি খেয়ে নিত্তি হবে।

দেবনাথ আবার চকিত হন।

কী? কী কাটিয়ে এনেচো?

গয়লা বাড়ি থে' এট্টু ছ্যানা—

আঃ! এসব আবার কেন? তোমার কেবল খাওয়ানোর চেষ্টা!

বলেন, তবে হাত বাড়িয়ে নেন'ও পাথরের বাটিটা।

এতো? তোমার কই?

আমার?

অহল্যা হঠাৎ ছেলেমানুষের মত হেসে ওঠে, আমি ছ্যানা খেতি বসবো?

বাঃ! বসাবসি আবার কী? আমিই বা খাচ্ছি কেন?

আপনি আর এই হাড়দুখী অহোল্যা সোমান হলো বাবা? ন্যান তো খেয়ে নাও। খাঁটি গরুর দুধে টাটকা ছানা, অহল্যা তাতে দু'খানা বাতাসা ভেঙ্গে মেখেছে।

দেবনাথ পরিতৃপ্তির সঙ্গেই খেয়ে ফেলেন সবটা, তবে নিঃশ্বাসও ফেলেন। বলেন, মেয়েরা যে কেন এমন হয়! নিজেরা কিছু খাবেনা, সব কেবল পুরুষদের খাওয়ারার তাল করবে। সবাই সমান।

অহল্যা হঠাৎ বলে ওঠে, ওসব মেয়েরা কোতায় বাবা?

কারা?

অবাক হন দেবনাথ।

ওই যে যেনাদের কতা বললে। নিজিরা খেতি চায়না—তারা কে হয় আপনার?

দেবনাথ অন্যমনস্কের মত বলেন, কে হয়? কই কেউ হয় না তো। এমনি যারা সব থাকে আর কি!

অহল্যা আর এ প্রসঙ্গে এগোতে চায় না। অহল্যার ভয় করে। তার থেকে অন্য কথা ভাল।

কিন্তু কী সেই অন্য কথা!

অহল্যা কটা কথাই বা জানে? আর সেই জানার জগৎটা কি ওই ঠাকুর দেবতার মতন মানুষটার জগতে পৌঁছবার মত? অথচ শুধু চুপ-চাপ বসে থাকা তাতে যেন কেমন গা ছমছম করে। ভয় করে

নিজের জন্যে নয়। তারাপদর হঠাৎ আবির্ভাবের ভয়ে। দুয়োর তো ঠেলবেনা হতভাগা, হয়তো বেড়া ডিঙিয়েই ঢুকে আসবে। আর পরে

গঞ্জনা দেবে, ওই বদমাসটার মুকেরপানে হাঁ করে চেয়ে বোসে থাকা হয়েছিল ক্যানো? অ্যাঁ।

অহল্যা অবশ্য হার মানেনা।

কড়া গলাতেই প্রত্যুত্তর দেয়, ফের? খপরদার বলি দিইচি না ছোট-নোকের মতন কতা বলবিনা।

তারাপদ অবশ্য তখন মিইয়ে যায় যায়। তবু মুখ সাপোর্ট করে। তারাপদ অ্যাকা বলতেচে না। দশে ধম্মে বলচে।

তারাও তোর মতনই ছোটনোক।

হুঁ। রাজ্জিসুদ্দু সবাই ছোটনোক, একলা তুই যতো ভদ্দর।

নিয্যাসতো? তোদের ছোটনোকমি দেকলে আমার গা ঘিনঘিন করে।

ওঃ। তাই, অ্যাকটা ভদ্দর নোক বাপ পুষেচিস।

ফের অভব্যি কতা? পুষিচি! তোর অনেক জম্মের ভাগ্যি ছেলো যে উনি হেন জন তোর ঘরে এসে আশ্রয় নেচেন। আমার তো মনে ন্যায় শাঁপ ভরস্টো দেবতা। নক্কীর পাঁচালীতে শুনিসনাই, মা নক্কী দারিদ্দির বামুনের ঘরে বারো বচ্ছর তিলসনদাসী বিত্তি করেছেলো।

তারাপদ অতএব হি হি করে দাঁত বারকরে বলে, তা' এতো—আর নক্কী নয়, নারায়োণ!

তা' তাই! বৈকুণ্ঠের নারায়োনই? ছলনা করতে তোর ঘরে এসে—

এই সব পরিস্থিতি ঘটে যায় মাঝে মধ্যে।

অতৃন্যার সেটাই ভয়।

কিন্তু এমনিতে যে গাছমছমানি, সেটা অহল্যার ওই কল্পনা প্রসূত ধারণার ফল।

কে বলতে পারে কোনো শাপভ্রষ্ট দেবতা কিনা। চুপচাপ বসে থাকলেই মুখে ওই যে একটা 'আকাশ পাতাল ভাবা' ভাবটা থাকে, তাতেই ভয় হয়, হঠাৎ বুঝি ছলনা ভেঙে যাবে, আকাশের দেবতা

আকাশে মিলিয়ে যাবে।

সমস্যা এই সব।

কিন্তু এখন সমস্যার সমাধান আপনিই হয়ে গেল।

দেবনাথ নিজেই বলে উঠলেন, আচ্ছা—ইয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ, অহল্যা। তুমি হঠাৎ নিজেকে হাড় দুঃখী বললে কেন?

অহল্যা সমুদ্রে তলাবার মুহূর্তে হাতের মুঠোয় চেপে ধরবার একটুকরো কাঠ পায়। বলে ওঠে, তা' হাড় দুখ্যী ভেন্ন আর কী বাবা। কোন—ছোটকালে মা বাপ দু'জনাকে খেয়ে বোসে আছি, জ্যাটার সোম্মস্যারে হ্যানোস্থার জেবনে কেটেচে। তা' পর তো দেকছেই কেমন নোকের হাতে পড়েচি। তাও দ্বিতীয়ো পোক্ষের।

দেবনাথ চমকে বলেন, কার হাতে পড়েছো?

অহল্যা মুখনীচু করে আস্তে বলে, এই তো নিজির চোখেই দেকচো। বাবা? কেমন আচার আচ্‌রণ আপনার জাম্যয়ের।

দেবনাথ অস্ফুটে বলেন ও তোমার স্বামী! বিশ্বাস হয় না। আশ্চর্য।

কী বল'তেচো বাবা ?

বলছি—বলছি, তুমি রূপকথার—গল্প শুনেছো কখনো?

রুপকতা?

অহল্যা বিষন্ন গলায় বলে, মা য্যাখোন মরেছেলো, ত্যাখোন কিছুকাল অ্যাক ম্যাসির ঘরে গে থাকতি হয়েছেলো, ত্যাখোন মাসির শাউড়ি অনেক গপপো বলতো বলতো আয় রূপকতা শোন- রাজকন্যে রাজপুত্তুর—

ওঃ। তা' হলেতো ভালোই? জানো তো।

দেবনাথ বলেন, 'রাজকন্যেকে' দৈত্য দানব রাক্ষসরা ধরে নিয়ে গিয়ে কারাগারে, মানে জেলখানায় পুরে রেখে দিতো, এ গল্প শোনোনি?

ছ্যাঁয়া ছ্যাঁয়া মনে পড়ে। আপনি একখানা বলোনা বাবা।

আচ্ছা বলবো একদিন!

বাবা, আমিতো আপনার মেয়ে, তবে আমাকে তুই তোকার করোনা

কেন ?

আমার মেয়ে।

দেবনাথ ঠিকরে ওঠেন, আমার মেয়ে মানে ? কোথায় সে ? কী রকম দেখতে ? নাম কী ?

ভারী উত্তেজিত দেখায় দেবনাথকে।

অহল্যা থতমত খায়।

অহল্যা কি বলে উঠবে, তার নাম 'বেণু' হতি পারে।

না অহল্যার ও কথা বলতে সাহস হয় না। কিসের ভয় তা' জানেনা, তবু ভয়ে বুক কাঁপে। তাড়াতাড়ি বলে, এই আমি তো আপনারে 'বাবা' ডাকি, তাই বলতেচি। দোষ অপরাদ হলো বাবা ?

দেবনাথ স্তিমিত হয়ে যান। বলেন, সে কি। না না দোষ কিসের আমারই যে কী হলো।

....

নেহাৎঅজ গণ্ডগ্রামের চাষীবাসী ঘরের মুখ্যু সুখ্যু একটা মেয়ে—অহল্যা, তবু অহল্যার মধ্যে যেন গ্রামের আর পাঁচটা মেয়ের থেকে চিন্তাশক্তি অনেক বেশী। অনেক বেশী অনুভূতি।....হয়তো ছেলেবেলায় মা বাপ হারিয়ে পরের দয়ায় অবহেলায় শৈশব কেটেছে বলেই অহল্যার মধ্যে রাগ অভিমান, তীব্রতা তেজ। সরলতা সবলতা, এই রকম কতকগুলো পরস্পরবিরোধী ভাব, গড়ে উঠে অহল্যাকে খানিকটা চিন্তার গভীরে তলিয়ে যাবার ক্ষমতা জুগিয়েছে।

বিহঙ্গর বৌ, হারাণের বৌ, গঙ্গাধরের ভাই বৌটা, এদের মত শুধু ধান, চাল, ঘুঁটে, গোবর, এইটুকু পরিধির মধ্যেই তার চিন্তার গতিবিধি আটকে থাকেনা। ওগুলো অহল্যার হাত পায়ের কাজ মাত্র। মনের খোরাক নয়।

তবে রুচিবোধ আছে বলেই অহল্যা যা করে পরিপাটি করে করে।

পাড়ার মধ্যে তারাপদর ঘরে লক্ষ্মীশ্রী টলটল করছে। ছেলেপুলে নেই। অসীম গতর, কত কাজ করেও কত অবসর। সেই অবসরটাকে অহল্যা আর পাঁচটা বৌ মেয়ের মত ঘুমিয়ে খরচ করেনা, কিছু না হোক মাটি কুপিয়ে গাছ পোঁতে, খেজুর পাতা জোগাড় করে এনে চ্যাটাই বোনে। ···মানে বুনতো—এখন অহল্যার আর অবসরের বালাই নেই। অহল্যা তার ঘরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে বসে আছে, তার জন্যে কাজের অন্ত নেই। কাজ হাতেরও যত, মনেরও ততো।

মানুষটা কোনখানের কোথা থেকে কী ভাবে এসে পড়লো! ···চির কালই মাথা খারাপ ছিল কী? ছিলনা নিশ্চয়। তা থাকলে, অমন রাজারমতন চেহারা থাকতো না, অমন বাবুর মত সাজসজ্জে।

আহা এই অভাগা হতভাগী অহল্যার কাছে এসে এই কতগুলো দিনের মধ্যেই কী হাল হয়েছে মানুষটার। ····উনি কি ছিরামপুরের? চন্নোন নগরের? নবোদ্বীপের? মন নেয় যেন কলকেতার।

একদিন ঘুরিয়ে জিগ্যেস করলো, বাবা আপনি টেরামগাড়ি চেপেচো?

নেহাৎ ছোটকালে একবার যোগে গঙ্গা নাইতে যেতে জ্যাঠাজ্যেঠি মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, কলকাতার সেই জমজমাটি চেহারার ছায়াছায়া ছাপ আছে অহল্যার মনে। ট্রামগাড়ি চেপে তারা কোথায় যেন মা কালীঠাকুরের মন্দির দেখতে গিয়েছিল। তাই হঠাৎ সেই সূত্রটাই টেনে এনে বুঝতে চেষ্টা করছে মানুষটা কোনখানের।

'বাবা আপনি টেরামগাড়ি চেপেচো?

শুনেই দেবনাথ হঠাৎ প্রায় স্বভাবছাড়া উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন, 'টেরামগাড়ি?' টেরামগাড়ি চাপিনি? এ এক আচ্ছা পাগলা মেয়ে তো! ট্রামগাড়ি চাপবনা? হা হা হা।

অহল্যা ওই হাসিটার দিকে অভিভূত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। কথা জোগায়না মুখে। ···কী বললো উনি! 'আচ্ছা পাগলা মেয়েতো!'

কাকে বললো?

অহল্যাকে ?

কিন্তু এতো হাসির পরই হঠাৎ থমকে গেলেন দেবনাথ।

ট্রামগাড়ী !

কবে ? কোথায় ?

কী ভয়ঙ্কর শূন্যতা !

কোনো কিছু অাঁকড়ে ধরবার জিনিস নেই।

অথচ দেবনাথ একখানা চলন্ত ট্রামগাড়ীতে চেপে বসে চলেছেন জানলার ধারে। ....পথের দুপাশের দৃশ্যগুলো ছুটছে তাঁর সঙ্গে। ... ঘরবাড়ি .... দোকান, বাজার, দেয়ালে সাঁটা পোষ্টার .... আরো সব কত কী। ....

আশ্চর্য ! একটুও দাঁড়াচ্ছেনা কেন ? ওরা ?

তিনি তো তা'হলে ওই সব লেখাগুলো পড়ে ফেলতে পারতেন ! কিছুতেই দাঁড়াচ্ছেনা ! ছুটেই চলেছে।

শীতলাতলার সুবুদ্ধি ঠাকুর হাতের সিঁদুর মাখা সুপুরিটা চোখের সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলেন, সম্পূর্ণ মন্দ-লোকের কাজ। পান কি চা কোনো নেশার দ্রব্যের সঙ্গে কিছু খাইয়ে দিয়েছে।

অহল্যা কাতর গলায় বলে, ক্যানো খাইয়ে দেচে তা কিছু দেকলে ঠাকুর ?

ক্যানো আবার ? বিষয় সম্পত্তির লোভে।

তো, নাম কি, কোতায় বাড়ি, কোতা থেকে সব্বস্ব খোয়া গেচে। এসব দেকতে পাবেনা ?

সুবুদ্ধি আরো গম্ভীর ভাবে বলেন, সবই দেকতে পাওয়া যায়। তবে মায়ের কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকতে হবে। তাও শনি মঙ্গল পাওয়া চাই।

তা এই বেভুলের কোন পিতিকার হবেনি বাবা ?

হতে পারে। কিছু খরচ করতে হবে।

অহল্যা চট ক'রে নাক থেকে সোনার নাকছাবিটা খুলে ফেলে সামনে ধরে বলে, এতে হবে বাবা ?

সোনা !

সুবুদ্ধি ঠাকুর লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অবহেলার গলায় বলেন, ও আর কতটুকুনই।

তো সোনা বলতে তো আর কিছু নাই বাবা ?

দেখি। তুই যখন এতো ইয়ে করচিস। কমেই করে দেব। একটা পথকুড়নো মানুষকে নিয়ে তোর এমন চিন্তা কেন তারাপদর বউ ?

অহল্যা অকারণেই একবার কপালে দুহাত জোড় করে বলে, 'বাবা' ডেকেছি ঠাকুর। শৈশব কালে বাপকে খুইয়েছি। বে হয়ে এসে দেকি, এখেনেও সে ঘরে শুন্যি। 'বাবা' ডাকার বড় সাধ। তা অমন রাজার মতন মানুষটাকে খাওয়াতে মাখাতে, 'বাবা' বলে ডাকতে প্রাণটা ভরে ওটে।

সুবুদ্ধি, দুষ্টবুদ্ধি মাখা হাসি হেসে বলে, ক'দিন হলো এয়েচে ?

সেইতো রতের দিন দুই পরে। আর অ্যাখোন এই পুন্নিমে গেল। হিসেব করে ছ্যাকো !

কিছু জ্ঞান নেই ?

ওমা জ্ঞান থাকবেনি ক্যানো ? কতো গেয়ান। কতো ঠাকুর দেবতার গপপো বলে আমায়। বলে, বেশ নাম তোমার। অহোল্যা। অহোল্যা পাষাণী হয়ে গেছলো, রামচন্দ্রের চরণ পশ্যে আবার মানুষ হলো।

তবে বেভুলটা কী ?

নিজের নাম পেরিচয় বলতে পারে না। কোতা থেকে এয়েচে, ক্যানো বেইরেছেলো, ঘরে কে আচে, এসব কিচ্ছু বলতে পারেনা। এটা আপনাকে ভাল করে দিতি হবে ঠাকুর মশাই।

সুবুদ্ধি অহল্যার ব্যাকুল ভাবটা লক্ষ্য করে।

আরো দুষ্টুহাসি হেসে বলে, তো ভাল করে দিলেই তো তোর কারবার ফুরিয়ে গেল।

কারবার মানে?

অহল্যার চোখে আগুন।

আহাহা, দোষের কিছু বলি নাই। বলছি এই যে খাওয়াচ্ছিস, মাখাচ্ছিস, বাবা বলে ডাকছিস, এ সুখটি তো যাবে।

আমার সুকের নেগে আমি বলি নাই। মানুষডা ভালো হোক।

হবে হবে, তবে খরচা কিছু করতে হবে। কিন্তু খবরদার! পাঁচকান করবি না। পাঁচকান হলে ওষুধের কাজ হবে না। যে লোক মন্দ করেছে, সেও মহা শক্তিশালী, তাকে কাটান করতে হবে তো?

অহল্যা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গণৎকারের মুখের দিকে তাকিয়ে ধাতব গলায় বলে, সে নোক মেয়েছেলে, না বেটাছেলে?

সুবুদ্ধি অনুভব করেন, অহল্যার যেন এখন আর ভক্তি বিশ্বাস বিগলিত দৃষ্টি নয়। হাওয়া বুঝে ফেলে বলেন, বেটাছেলে, বেটাছেলে। বললাম তো—সম্পত্তির লোভে।

অহল্যা বলে, আচ্ছা যাই। নাকছাবিটা ফেরৎ দ্যান। আমার পিতিকারে কাজ নাই।

সুবুদ্ধি বিস্মিত হয়। বেটাছেলে শুনেও মেজাজ খাপ্পা কেন?

তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন সুবুদ্ধি, এ্যাই দ্যাখো অবুজ মেয়ের কাণ্ড! মায়ের নামে দিলি আবার ফিরিয়ে নিবি কীরে? রেখে যা, রেখে যা, মায়ের নামে পূজো চড়াবো।

হাত জোড় করে 'মা শেতলা' বলে একটা হুঙ্কার ছাড়েন সুবুদ্ধি ঠাকুর!

তারপর গাঢ় গলায় বলেন, বাপটি সেরে উঠলে, পরে মায়ের থানে পূজো দিয়ে যাস কেমন?

শেষে যতই সামলে নিক, সুবুদ্ধি ঠাকুরের ওই ধূর্ত শেয়ালের মত হাসিটা অহল্যার বিষ লেগেছে। মনে মনে বলে, বুদ্ধির দোষে নাকছাবিটা

খোয়ালাম। যাক! মা শেতলার নামে পড়ল, তিনি মনে মনে নেবেন। ...মনসা পিসিকে ধরতে হবে, তিনি যেন কোথায় যায়, কোন সন্নিসীর থানে।

....

কিন্তু শুধুই কি সুবুদ্ধি ঠাকুর?

কুবুদ্ধি দুর্বুদ্ধির সংখ্যাতো আরো বেশী।

গ্রামের লোক তারাপদকে হেসে হেসে বলে, তোর দোজপক্ষের পরিবার খুব চালু আছে রে পদ! তোকে ভ্যাড়া বানিয়ে থুয়ে কেমন একখানি বাপ পিতিষ্ঠে করেছে ঘরে। আর তুই তার নৈবিদ্যির জোগাড় করে বেড়াচ্ছিস।

তারাপদর মাথা কাটা যায়, তবু লোক সমাজে মুখ রাখতে একটা গল্প ফাঁদে। বলে 'পিতিষ্ঠে' ওর থেকে আমিই বেশী করচি।

ক্যানো?

ক্যানো আর? অবিসন্দি আচে। এরকম একটা বাবু মানুষ মাতা খারাপ হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে বাড়ির লোক খপরের কাগচে নেকা ছাপায় না, সন্দান দিতে পাল্লে পুরোসকার দেবে? সেই তালে আচি।

তো—তুই বুজি খপরের কাগচ পড়িস?

ওরা হাসে।

তারাপদ বলে, আমি আর কোথাথেকে পড়ব? সে বিদ্যে আচে? বেন্দাবনের ছেলেটা ছিরামপুরে মাসির বাড়ি থেকে ইস্কুলে পড়ে, ছুটি ছাটায় আসে, তার কাচ থেকে জেনে নেব।

বিহঙ্গই বেঁশী হাসে।

বলে কাঁটাল রইল গাচে, তুই অ্যাথোন গোঁপে ত্যাল দে।

গ্রামের লোক বোকা হতে পারে, কিন্তু ধুর্তামিতে কম যায় না। তারাপদ যে পরিবারের বদনাম ঢাকতে এসব কথা বলে, তা বুঝতে পারে।

অনেকেই অনেক কিছু 'বুঝে' ফেলে এবং অহল্যার আড়ালে হাসি টিটকিরি করে। শুধু অহল্যা বুদ্ধিমতী হয়েও সেটা ধরতে পারে না। সে যেন একটা ঘোরে আছে। তার ধারণা, 'বাবা' বলে ডাকার ক্ষেত্রে, কেউ কোনো আকথা কুকথা বলতেই পারে না।

॥ ১১ ॥

আর যে লোকটা সত্যিকার 'ঘোরে' আছে ?

যে কিছুতেই মনে করতে পারছে না, সে কে ? তার নাম কী ?

কখনো মনে হয় এই আকাশ বাতাস গাছপালা ঝোপ জঙ্গলের বুনো বুনো গন্ধ, ভোর রাতে জানা না জানা পাখির কলরব, গোরুর হাম্বা ধ্বনি, দূরে চরতে যাওয়া ছাগলের 'ব্যা ব্যা' ডাক, সব কিছুই যেন তার চিরচেনা। আবার কখনো কখনো প্রাণের মধ্যে কেমন হাহাকার করে ওঠে। মনে হয় তার যেন অনেক খানি কী হারিয়ে গেছে। সেখানে তার কত কী রয়েছে। ও সেখানে যেতে পারছে না। বুঝতে পারছেনা কিসের এই অস্থিরতা।

অহল্যা নামের মেয়েটা যখন তার সামনে ভাত বেড়ে দিয়ে কাছে বসে থেকে খাওয়ায়, জোর করে বলে, 'না বাবা না। ও কড়া আপনারে খেতিই হবে। ফেললে চলবেনি।'

তখন ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে ভাবেন, মেয়েটার অন্য একটা কী নাম ছিল না ? ভাবেন মেয়েটা এমন ময়লা ময়লা কাপড় পরে কেন আজকাল ?

অহল্যা ওই চেয়ে থাকাটা দেখলে নিজে অস্বস্তিও পায় না, লজ্জাও পায় না, পায় ভয়। ভয় এই যদি, তারাপদর চোখে পড়ে যায়, আড়ালে গিয়ে অহল্যার চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে বাঘের মত গর্জনে বলবে 'বাপ! বাপ ডেকেছি! কেউ কিছু বলতে নারবে।' বলি মেয়ের মুখের দিকে অমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কোন হারামজাদা বাপ ?

অহল্যা তাই তাড়াতাড়ি চমক ভাঙায় নোকটার। বলে, বাবা, আপনি খেতে বসে অমন অন্যোমনা হয়ে কী ভাবো বলো তো ?

কই কী ভাবি ?

দেবনাথ তাড়াতাড়ি আবার দুগ্রাস খেয়ে নিয়ে বলেন, যে রাঁধে তাকে বলে দিসতো মা ভাতটা যেন শক্ত না করে।

অহল্যা বোঝে তাদের এই মোটা আউশ চালের ভাত ওনার খাবার যুগ্যি নয়, এবং এই কথাটা সেই বাবদই। তবু ইচ্ছে করে হেসে উঠে বলে, বলে আবার কারে দেব বাবা ? নিজেই তো রাঁদি।

ও আচ্ছা ! আচ্ছা ! তাহলে ঠিক আছে।

দেবনাথ লজ্জিত হয়ে আবার যা পারেন খান।

অহল্যা হাতে জল দেয়।

দেবনাথ কুণ্ঠিত ভাবে বলেন, এসব কেন ? এসব কেন ? কল টলগুলো কোথায় গেল !

আবার কখনো কখনো সন্ধ্যাবেলা অহল্যার যখনকোনো কাজ থাকে না, দাওয়ায় মাদুর পেতে দেবনাথকে বসতে দিয়ে নিজে পা ঝুলিয়ে একপাশে বসে, তখন বলে, বাবা একটা গপ্‌পো বলেন।

আশ্চর্য ! দেবনাথ হঠাৎ হঠাৎ রামায়ণ মহাভারত থেকে এক একটা কাহিনী দিব্যি বলে যান। অহল্যা উদ্ধারের গল্প তো না বলতেই বলেছিলেন। কখনো আবার খুব বিপন্ন ভাবে বলেন, সেই ছেলেটার নাম কী অহল্যা ?

কোন ছেলেটা বাবা ?

সেই যে গুরুর আদেশে, ওঃ সেই মহানিষ্ঠুর গুরুর আদেশে আঙুলটা কেটে ফেলল।

নামটা বল না ?

আমি ওসবের কী জানি বাবা।

তাই তো ! মহা মুস্কিলে পড়ে গেলাম তো !

আকাশে কখনো শুক্লপক্ষ, কখনো কৃষ্ণপক্ষ। কখনো আলো কখনো ছায়া। উঠানের বাতাবি লেবুর গাছটা, তেঁতুল গাছটা, বাতাসে পাতা

নাড়িয়ে আলোআঁধারির সৃষ্টি করে। আর চেতনার আলো আঁধারিতে বিপর্যস্ত একটা মানুষ খুব বিপন্ন উদ্বিগ্ন মুখে অসহায় গলায় বলে, আচ্ছা অহল্যা ! তোমার নাম তো অহল্যা ?

হ্যাঁ তো।

আচ্ছা, এমন কেন হয় বলতো ? সবসময় মাথার মধ্যে যেন কত লোকের ভীড়। তারাসব আসছে যাচ্ছে, চলাফেরা করছে কতকী কথা বলছে, অথচ কিছু বোঝা যায় না। চোখ বুজলেই বাড়ে। রাত্রে শুতে পারি না, বসে থাকি। আমার যেন সব কেমন গোলমাল হয়েগেছে অহল্যা।

আবার হঠাৎ এদিক ওদিক তাকিয়ে ভয়ের গলায় বলে ওঠেন দেবনাথ নামক মানুষটার ছায়ামূর্তি। ওই লোকটা কোথায় ? —ও নেই তো ? ওকে আমার বড় ভয় করে !

অহল্যা জানে 'ও লোকটার' আসার সম্ভাবনা এখন কম। কম কেন, নেইই। শশীকামারের বাড়ির আড্ডা ছেড়ে নড়বেনা। তবে যদি বদ-বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে অহল্যাকে হাতে নাতে ধরবার চেষ্টায় আসে।

কিন্তু কী ধরবে ?

তিন হাত দূরের কম তো বসেই না অহল্যা।

তবে সাহসে হারে না।

হেসে উঠে বলে, ভয় আবার কী বাবা ? ও তো আপনার জামাই !

আমার জামাই !

দেবনাথ উত্তেজিত হয়ে বলেন, কখনো না। ও আমার জামাই হতে যাবে কেন ? ওতো একটা ছোটলোক ! আমার জামাই, আমার জামাই, না মনে পড়ছেনা। কিন্তু ও কিছুতেই না। আমার জামাই অমন বিচ্ছিরী সাজ করতে যাবে কেন ?

তার মানে 'বিচ্ছিরি সাজ' সম্পর্কে চেতনা আছে দেবনাথের। কিন্তু নিজে ? নাঃ নিজের সাজ সম্পর্কে কোন চেতনা নেই একদার দেবনাথ

রায়ের।

তাই তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় একটা মোটা ধুতি আর আধময়লা গেঞ্জি পরে। তা এসাজে এখন বেশ মানিয়েও গেছে। এখনতো আর আগের সেই 'দেবনাথ রায়' বলে চেনার উপায় নেই। সেই সোনার মত রংও নেই, মুখে সেই অভিজাত লালিত্যও নেই।···সর্বদা একটা আলো আঁধারির জগতে বাস করতে করতে উজ্জ্বল মসৃণ কপালটায় একটা গাঢ় মলিন ছাপ।

প্রথম প্রথম বলতেন, চটিটা যে কোথায় গেল। তোয়ালেটা যে কে কোথায় ফেলল।··· ক্রমশঃ বোধ হয় ওই শব্দগুলো ভুলে গেছেন। খালি পায়েই হাঁটেন।···বুনো তাঁতীর ঘর থেকে অহল্যা যে গামছাখানা কিনে এনে দিয়েছিল সেটাই কাজ চালিয়ে দিচ্ছে।

ধুতি গামছাও অহল্যা বুনোকে দিয়েই আনিয়েছে। হপ্তায় হপ্তায় হাটে যায় বুনো, গামছা বেচতে, সুতো আনতে।

তারাপদ অবশ্য ঝেড়ে জবাব দিয়েছিল, আমার অ্যাতো পয়সা নাই, যে পাতানো শোউরের জন্যি পোষাক আসাক কিনতে যাবো। খাওয়া টানতেই বলে—

অহল্যার যেন সত্যিই বাপ ভাই কেউ, অহল্যার দুঃখে অভিমানে চোখে জল আসে। বলে, কতোই খায়! দুদ দৈ মাখোন মিছরিতে ডুইবে রেকেচিস অ্যাকেবারে।

বুনোকে অহল্যা 'মেসো' বলে। বুনোর বৌ তার মামার বাড়ির গাঁয়ের মেয়ে। তাই বুনোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র। রূপোর মল হয়েছিল বিয়ের সময়। বয়েস হয়েছে, এখন আর পরেনা, সেটাই বেচেছে বুনো মারফৎ।

দেবনাথ রায় নামের সেই অ্যারিষ্ট্রোক্যাট মানুষটা এখন হেটো ধুতি, আর মোটা গেঞ্জি পরে খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায়। এই সাজের সঙ্গে দামী চশমাটা ভারী বেমানান। আরো বেমানান ছিল হাতের ঝকঝকে আংটি দুটো। অহল্যা একদিন সে দুটো চেয়ে নিয়ে তুলে রেখেছে।

লক্ষ্য করেছে, তারাপদর লুব্ধদৃষ্টি যেন ওই আঙুলগুলোর ওপর আটকে থাকে।

অতএব বলেছে, বাবা, আপনি আলাভোলা মানুষ, যেখেনে সেখেনে ঘোরেন, কে কেমনে কেড়ে বাকড়ে নে' নেবে, খুলে দ্যাও আমি তুলে রাকি।

কেড়ে নেবে।

দেবনাথ অবাক অবাক ভাবে খুলে দিয়েছেন।

নিজের খালি আঙুলটা চোখের সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন।

তারাপদর ওটা চোখে পড়তেই সেয়ানের হাসি হেসে বলল, তো খুব একটা মাস্তামেরে নিলি তো অহল্যা। তাই অ্যাতো বাবা বাবা! ···তা করেচিস বেশ করেচিস, রেকেচিস কোতায়?

অহল্যা কঠিন চোখে তাকিয়ে বলল, কী কোতায় বেকেচি?

আহা তোর বাপের আংটি দুটোর কতা বলতেচি, আবার কী?

কোতায় রেকেচি, সে খোঁজে তোর দরকার?

বাঃ। দামী জিনিস, কোথায় আনেবানে ফেলেচিস, কিনা জানবনা?

জেনে কাজডা কী? তাড়ির পয়সা কমতি হলি, শশীর দোকানে বাঁদা দিবি বলে?

ছোটো মুকে বড় কতা কইতে আসিসনে অহোল্যা।

তুইও ছোটোমুকে ছোটোনোকের মতন কতা কইতে আসিসনে। ব্যস। ....বেভুল মানুষ, যেখেনে সেখেনে যায়, খুলে তুলে রেকিচি। আর শুদোতে আসবিনে।

॥ ১২ ॥

তা' অহল্যার কথাটা মিথ্যা নয়।

যেখানে সেখানেই যায় বটে ওই বেভুল মানষটা।

একদিন দেখা গেল সেই কতোখানি দূরে পাঁচমাইল রাস্তা ভেঙে হাটে গিয়ে হাজির হয়েছে। ....কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে এটা ওটা দেখছে। হাত দিয়ে নাড়ছে আবার রেখে দিচ্ছে।

হঠাৎ একখানা তালপাতার পাখা হাতে তুলে নিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, দাম কত হে ?

পাখাওলা বাকি পাখাগুলো নিজের কোলের গোড়ায় টেনে নিয়ে অবহেলা ভরে বলল, তিরিশ পয়সা।

দেবনাথ অথবা দেবনাথের কঙ্কাল গেঞ্জির বুকটায় একবার হাত বুলিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দুটো পাশ চাপড়ে থতমত খেয়ে বলল, পার্স টা !

বুনো আগেই ইতিহাস চাউর করে দিয়েছে। ওঁকে দেখেই তাই সকলেই মুখ চাওয়াচায়ি করেছে, হাসাহাসিও করেছে।

তারাপদ কি একটা গাড়োল !

তো পুলিশে জানান করতেচে না ক্যানো তারাপদ ? অন্দরের মধ্যে অ্যাকটা পাগোল ছাগোল মানুষ সেঁদিয়ে বসে আচে।

পাগোল ছাগোল কি বজ্জাত, তা জানো তুমি খুড়ো ?

বজ্জাত মনে নেয়না। বড়ঘরের মানুষ তাতে সন্দ নাই।

ওরে বেহঙ্গ, বড়ো ঘরেই বড়ো কীত্তি ! খুন জখম করে পাইলে ব্যাড়াচ্চে কিনা কে জানে ? আমার তো মনে লাগে পুলিশে অ্যাকটা ডাইরি করে দেলে উচিত হয়। আসলে সাজা পাগোল কি না বিশ্বাস কী ?

গ্রামের এই মানুষগুলোর বহির্জগতের সম্বন্ধে আর কোনো জ্ঞান থাক না

থাক 'থানা পুলিশ, ডায়েরি, নালিশ, বাদী বিবাদী' এই সব শব্দগুলো সম্পর্কে খুব জ্ঞান আছে।

আছে, রাজনীতি সম্পর্কেও ঘোরতর জ্ঞান এদের। 'ভোটবাবুদের' নিয়ে রং তামাসা করবার মত বুদ্ধিও আছে। ....আবহমানের নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবনের একটানা ছন্দটুকু বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, 'ভোট' নামক এক অদ্ভুত ভূতের ঘাড়মটকানিতে।

সেই ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে এদের শান্তি সন্তোষ, সততা সরলতা। উড়িয়ে নিয়ে গেছে ধর্মবোধ, পাপপুণ্য বোধ, ন্যায় অন্যায় বোধ, বিশ্বাস ভালবাসা, এ সবের বদলে দিয়ে গেছে লোভ, দুর্নীতি, ধূর্তামি ফেরেববাজি, ছলনা, হিংসা।

'ভোট' এই আরণ্যক মানুষগুলোর সমস্ত মনুষ্যত্বটুকু কেড়ে নিয়ে তাদের চিরকালের মায়াকাজল পরা চোখকে ফুটিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে ফেলেছে 'তোরাও মানুষ।'

সেই দৃষ্টিফোটা চোখ নিয়ে তারা এখন ওই ভোটবাবুদেরই ব্যাখ্যানা করতে শিখেছে। শিখেছে মানুষ মাত্রকেই অবিশ্বাস করতে।

কে একজন বলে, পদা বলে যাদের নোক হাইরেচে, তাদের কাচে পৌঁচে দিতে পাল্‌লে 'পুরোসকার' পাওয়া যাবে। তাই জামাই আদরে ঘরে পুষে রেকেচে।

ছাড়না ক্যানে। ওটা পদার 'কাটাকান চুল দে ঢাকা।' তবে হ্যা হ্যা হ্যা, জামাই আদরে না শোউর আদরে।

পাখাওলাও এসব আলোচনার অংশীদার।

এখন ভালোমানুষের মত মুখ করে বলে, কী হলো দাদু? পকেট মারা গেচে নাকি?

দেবনাথ একটু নিরুপায় নিরুপায় হাসি হেসে বলেন, তাই তো দেখছি। কখন যে কী ভাবে?

কতো টাকা ছেলো দাদু?

পেটের মধ্যে হাসির গুড়গুড়ুনি চেপে জিগ্যেস করে লোকটা, কতো ট্যাকা ছেলো দাদু ?

দেবনাথ একটু রাগের গলায় বলেন তা'কি আমি গুণে রেখেছিলাম ?

অ। তা বটে। ট্যাকা তো আর গোণার দ্রব্যি নয় যে, গুণতে বসবেন ? তো ছেলো কোতায় দাদু ?

কোতায় আবার থাকবে ? পকেটেই ছিলো।

তাই বুজি ? তো দাদুর বুজি গেঞ্জিতেও পকেট ছেলো ? হ্যা হ্যা হ্যা। ····পকেটকে পকেট কেটে সাফ করে নেছে, তালে ?····

হাসির গুঞ্জন।

অবশেষে ঠ্যালাঠেলি।

খুব একখানা ঝাড়লি বটে মুরুলী।

মুখখানা কেমন সাদা করে পাইলে গ্যালো দেকলি ? হ্যা হ্যা হ্যা। ····বলে কি না, 'ও! পাঞ্জাবী জামাটা ঘরে ফেলে রেকে এইচি।'

তবেই বলো সাজাপাগোল কিনা।

সেদিন অহল্যার কাছেও বকুনি খেয়েছেন দেবনাথ। যখন ফিরলেন, তখন সন্ধ্যে হয় হয়। বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলো অহল্যা। উদ্বিগ্ন মুখ, রুক্ষ এলোমেলো চুল। মুখের রেখায় উপবাসের ছাপ।

দেবনাথ ওকে দেখতে পেয়েই উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠেন, বেরোবার সময় পাঞ্জাবীটা দিসনি কেন বেণু ?

সঙ্গে পয়সা নেই হাটের মধ্যে না হক অপমান। বিচ্ছিরি করে হেসে বলে কি না, গেঞ্জিতে আপনার পকেট ছিল দাদু। ছি ছি!

বেণু! বেণু!

হঠাৎ হঠাৎ এই নামটা উচ্চারণ করে বসে মানুষটা!

অহল্যার মুখে আসে, 'বেণু কে ?'

সাহস হয় না। বুকটা দুরদুর করে।

যদি ওই জিগ্যেসের সূত্রে হঠাৎ যবনিকা উন্মোচিত হয়ে যায়। 'বেণু

কে' এ প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে মনে এসে যায় 'আমি কে?' ....'বেণু আমার কে?' কোথায় থাকে সেই বেণু।

তার মানে—ধূর্ত সুবুদ্ধি ঠাকুরের ভাষাটা ভুল নয়। অহল্যা 'যবনিকা' শব্দটার সঙ্গে পরিচিত নয়, জানেনা, উন্মোচন মানেই বা কী, তবু উপলব্ধির মধ্যে যেন ঘটনার চেহারাটা ধরে ফেলে। তাই প্রশ্ন করে ফেলেনা বেণু কে?

তার বদলে প্রায় ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, আপনি কখোন বোরোচ্ছেন আমায় কয়ে গ্যাচেন? ছ্যান করে ফিরে দেকি মানুষ ঘরে নাই। সমোস্তোডা দিন যা গেচে। ঘর আর বার।....

দেবনাথ অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি বলেন, বাঃ আমি জানতাম হাটে যাচ্ছি? হাঁটতে হাঁটতে পথ ভুলে চলছি, হঠাৎ দেখি মানুষজন সব দল বেঁধে একদিকে চলছে, আমিও মজা পেয়ে চললাম তাদের সঙ্গে।

মজা পেয়ে!

অহল্যা হঠাৎ কেঁদে ফেলে বলে, দিনভোর খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, এ ওদ্দুরে পতে পতে—

দেবনাথ থমকে বলেন, তুমিও বুঝি খাওনি?

আমার কতা হচ্চে না। আপনার কতাই কইচি।

নাঃ। তুমিও উপোস করে আছো। ইয়ে অহল্যা! মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। চলো চলো খেয়ে নিইগে চলো দু'জনে। ওঃ। সত্যি তো দারুণ খিদে পেয়ে গেছে তো!

কিন্তু বিহ্বল অহল্যা এই স্বর্গীয় কথাটার ভার সইবে কী করে?

খেয়ে নিইগে দু'জনে। মুক দেকে বুজতে পারচি উপোসে আচো।

স্বর্গের দেবতা মানুষের ঘরে এসে ঠাঁই নিলে, মানসিক ভারসাম্য রাখা সহজ না কি?

তবু অহল্যা শক্ত ধাতুর মেয়ে বলেই—

॥ ১৩ ॥

কিন্তু এমন ঘটনা কি একদিন ঘটেই থেমে যায় ?

দেবনাথ নামের একদার ভদ্র মার্জিত মানুষটা, আপন অসাবধানতায় অনুতপ্ত হয়ে সাবধান হয়ে যায় ?

তাই কখনো হয় না কি ?

'পাগল তবে বলেছে কেন ?

আবারও একদিন দেখতে পাওয়া যায় একটা মলিন শ্রীহীন মানুষ চেপে বসেছে গিয়ে 'ভোলা বৈরাগী'র আখড়ায় একেবারে বৈরাগীর মুখোমুখি।

তারাপদ বাউড়ির বাড়ি থেকে এতোটা দূর চলে এসেছে কী করে এই আশ্চয্যি। .... যখন বাটার দোকানের আশী নব্বুই টাকার মজবুত জুতো পায়ে দিতো লোকটা, তখন সিকিমাইল হাঁটতে পারতো কিনা সন্দেহ। খালি পায়েই কি বেশী হাঁটা যায় ? ....অথচ এইখানে নিয়ে আসবার জন্যে আজ কতদিন ধরে মনসা বুড়িকে খোসামোদ করছে অহল্যা।

বুড়ি বলে, অতো ধুর কে যাবে বৌমা ? পা টাটায়।

কিন্তু পা ছাড়া আর গতি কী এদের ?

রিকশা আছে ? না বাস আছে ?

দেবনাথ যে কেমন করে চলে এলেন ! আসলে পথ হারিয়ে হারিয়েই পথের নিশানা জুটে যায় দেবনাথের।

এ রাস্তাটা কোন দিকে গেছে ভাই ?

কুড়ুইগাছির দিকে দাদা।

কু-ড়ুই গাছি। সেখানে কী আছে ?

কী আছে ? কী আর থাকবে বলেন ? মানুষজন, গরুবাছুর। যাবেন কনে ?

যাবো কোথায় ? তা তো জানিনা ভাই। বেরিয়ে পড়লাম সকাল-বেলা। পথে বৃষ্টি এলো, বসে থাকলাম একটা গাছতলায়, বৃষ্টি থামলে আবার হাঁটছি।

তা ওদিকে কিচু নাই।

....

এ রাস্তাটা কোন দিকে গেছে দাদা।

বিন্দেপুর। কার বাড়ি যাবেন ?

কই ? না না। কারো বাড়ি যাবো না তো ?

তবে ? বেরিয়েছেন ক্যানো ?

এমনি। ...রাতটা কাটলে সবদিন আর বাড়ি বসে থাকতে মন চায় না।

আসচেন কোথা থেকে ?

আসছি ? আসছি সেই যে মেয়েটা ? যে আমায় 'বাবা' বলে ডাকে ? তার বাড়ি থেকে।

তো সে গাঁ-টা কী ? এই 'পাটুই' নাকি ?

পাটুই !

দেবনাথ আস্তে মাথা নাড়েন। না এ নাম জানিনা।

'বাবা' বলে ডাকে ? পুত বৌ বুঝি ? পরিবার নাই ?

আঃ এতো কথা কেন ? রাস্তাটা কোথায় যাবে তাই বলছি।

লোকটা বিড়বিড় করে বলে, মাতাটা বেগড়ানো। পুত বৌ দুব্যবহার করেচে আর কি ! মনের খেদে বেইরে পড়েচে। দয়ার গলায় বলে, সকাল অবদি পেটে কিছু পড়ে নাই বোধায় ?

দেবনাথ বিরক্ত গলায় আঃ ! বলে হন হন করে অন্য দিকে চলে যান।

দূর। কেউ কোনো একটা পথের সন্ধান দিতে পারে না। খালি আবোল তাবোল কথা! অথচ পথের সন্ধান তো চাই? দেবনাথকে তো তো যেতে হবে কোনো একটা জায়গায়।

....

হ্যাঁ প্রতিদিন সক্কাল হলেই মনের মধ্যে একটা তাগিদ অনুভব করেন দেবনাথ, কোথায় যেন যেতে হবে। ওই মেয়েটা উঠে পড়লে, অথবা সামনে পড়ে গেলে আর বেরোনোর উপায় থাকে না। তক্ষুণি একগাদা মুড়ি মেখে নিয়ে এসে খাবার জন্যে ঝুলোঝুলি করবে, অদ্ভুত একটা কালো মত জল গেলাশে ভরে নিয়ে এসে বলবে, 'বাবা চা খাও।' তারপর 'বাবা বাবা' করে রাশি রাশি কথা।

খুব মায়া হয়!

ভারী ভালো মেয়েটা।

এতো মিষ্টি ডাক, মন জুড়িয়ে যায়।

এমন ভাবে তাকায়, যেন মন্দিরে এসে ঠাকুর দেখছে। তবু বেরিয়ে পড়বার জন্যে প্রাণ ছটফট করে। ···তাছাড়া ওই বিচ্ছিরী লোকটা! কবে কোথায় যেন একটা 'নরকের' ছবিতে যমদূতের চেহারা দেখেছিলেন, কেবলই সেই ছবিটা মনে পড়ে ওই লোকটাকে দেখলে। কিন্তু মেয়েটা কেন বলে, 'বাবা ও তোমার জামাই।' জামাই! জামাই! এ কথাটা আগে যেন কোথায় শুনেছিলেন না দেবনাথ? কিন্তু ওই বিচ্ছিরী লোকটার সঙ্গে তার যোগসূত্র কোথায়?

॥ ১৪ ॥

আর কাউকে পথ জিগ্যেস করেননি দেবনাথ হন হন করে এমনিই যাচ্ছিলেন। হাঁটার ভঙ্গী আগের থেকে বদলে গেছে। খালি পায়ে হাঁটলে বোধহয় তাই হয়।

জিগ্যেস করেননি। —রাস্তায় লোকও বেশী ছিলনা, তার মধ্যেই হঠাৎ একজন দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, ভোলা বৈরাগীর আঘড়ার যাচ্ছেন ?

দেবনাথ বললেন, কেন ? সেখানে কী আছে ?

লোকটা হেসে বলল, বৈরিগীই আছে। আর রাধামাধবও আছেন। .... আগে বুঝি যাননি কখনো ?

না !

লোকটা অযাচিত ভাবে বলল, এই ডাইনে রাস্তা ধরে চলে যান। সামনেই দেউল চূড়ো চোখে পড়বে।

সেই এসে পড়া।

বৈরিগীর পরণে হালকা গেরুয়ার আলখাল্লা, গলায় কণ্ঠী, হাতে জপের মালা।

দু'একটা কথার পরই বললেন, বাবা বুঝি কলকেতার মানুষ ?

দেবনাথ চমকে উঠে বললেন, কলকাতা ? কলকাতা ? কোথায় কলকাতা ?

কলকেতা কলকেতাতেই !

বৈরাগী হেসে ফেলে বলেন, চোখের চশমা আঁর কথার ধরণ দেখে মনে হলো, তাই শুধোলাম।

তারপর হাতটা ধরে বললেন, বাবার হস্তরেখাটি দেখি একটু।

কী দেখলেন কে জানে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর আস্তে হাতটা ছেড়ে

দিয়ে বললেন. বাবার তো দুটি আংটি ধারণের অভ্যাস ছিল দেখছি খুলে রেখেছেন ?

দেবনাথ অবাক হয়ে বললেন, আপনাকে কে বলল ?

বাবার আঙুলের দাগই বলে দিচ্ছে।

দেবনাথ আস্তে বললেন, সেই ভালো মেয়েটা খুলে নিয়ে তু রেখেছে। বললো হারিয়ে যাবে — ।

মেয়েটি কে বাবা ?

দেবনাথ মাথা নাড়েন, জানিনা।

থাক ওকথা। বাবার নামটি কী ?

দেবনাথ একটু ব্যগ্রভাবে বলেন, ওই তো মুস্কিল। নামটা কিছুতে মনে পড়ছেনা।

নাম মনে পড়ছেনা !!

সেই তো বড় অসুবিধেয় পড়ে গেছি। নামটা মনে পড়ছেনা ?

অসুবিধে বৈকি বাবা, খুব অসুবিধে। তা খুব মন দিয়ে মনে কর চেষ্টা করেন না ? খুব চেষ্টা। মনকে একেবারে গভীরে তলিয়ে দিয়ে যেমন করে ভগবানের নাম চিন্তা করতে হয়।

ভগবানের !

দেবনাথ অন্যমনস্কের মত বলেন, কই সে চিন্তা কখন করলাম ? ক যেন কোথায় একটা ঠাকুর দেখতে গেলাম, কী ভীড়। কী শব্দ।

ভোলা বৈরাগী অনুভব করেন লোকটার অবস্থা। আর এও অনুভ করেন, এ পরিবেশের মানুষ এ নয়। নিজে তিনি শিক্ষিত, একদ সরকারি চাকরীও করেছেন নেহাত দীনহীন পদে নয়, উচ্চতর পোষ্টে জন্য আকুতিও ছিল, হঠাৎই একদিন সব কিছু তুচ্ছ মনে হলো। বেরি পড়লেন সংসার ছেড়ে। ঘুরে বেড়ান, যেখানটা ভাল লাগে, কিছুদি থেকে যান। গ্রাসাচ্ছাদন জুটেও যায়।

কিন্তু এ লোক তো ইচ্ছে করে সংসার ত্যাগ করেনি।

মাথার গোলমাল ঘটায়—বেরিয়ে পড়েছে।

খুব বেশী দিন নয় কিন্তু, এখনো আঙুলে আংটির দাগ। এখনো চশমাটা নাকে রয়েছে। চশমা ছাড়া একেবারে দেখতে পান না বলেই দেবনাথ ওটাকে হাতের কাছে না পেলেই ডাকেন বেণু। চশমাটা কোথায় রাখলাম রে।

বেণু নামটা বারেবারেই মুখে আসে, কিন্তু স্মরণে নয়। খেয়াল করেন না চশমার জন্যে বেণুকে ডাকছেন।

ভোলা বৈরাগী বলেন, যখন একা বসে থাকেন কী চিন্তা করেন বাবা?

চিন্তা? কই চিন্তা তো করিনা কিছু। একা হলেই যে কেমন কষ্ট হয়?

কষ্ট হয়? বলুনতো শুনি কষ্টটা কী রকম?

দেবনাথ অন্যমনস্কের ভঙ্গীতেই বলেন, এই কীরকম যেন মন কেমনের মত। মনে হয় যেন কোথায় কী পড়ে আছে আমার, আমি যেতে পারছিনা। নিতে পাচ্ছি না। কী সব যেন হারিয়ে গেছে খুঁজে পাচ্ছি না। বুকের মধ্যে একটা ট্রাবল হয়। অস্থিরতা লাগে। অথচ সবই তো ঠিক রয়েছে।

ভোলা বৈরাগী মনে মনে বলেন, আসল বস্তুটাই যে ঠিক নেই বাবা তাই কিছুই ঠিক নেই।

মুখে আস্তে বলেন, এই 'মন কেমন'টি বাবা, হচ্ছে আত্মার আকুতি। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার বিচ্ছেদ বেদনা। এই বেদনাই মানুষকে চির বিরহী করে রেখেছে। অতৃপ্তি আর ঘোচেনা তার। দেখুন জ্ঞান হয়ে ইস্তক মানুষ 'সুখ সুখ' করে তার পিছনে ছুটেছে, কিন্তু সুখও ছুটেছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, নাগালের মধ্যে আর ধরা দিচ্ছে না।··· 'না পাওয়ার' দুঃখ মানুষের চিরসঙ্গী। এই না পাওয়া সেই পরমাত্মার সঙ্গসুখ না পাওয়া।

দেবনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে শোনেন কথাগুলো। তারপর

হঠাৎ বলে ওঠেন, আমি আপনার কাছে থাকবো।

আমার কাছে? আমি তো বাবা ঘরছাড়া বৈরিগী, আজ এখানে আছি, কাল এখানে নেই।

কাল থাকবেন না?

দেবনাথকে উত্তেজিত দেখায়।

বলেন, মনে হচ্ছিল আপনি আমার কষ্টটা ভালো করে দিতে পারেন!

ভোলা ঠাকুর বলেন, কাল যে 'থাকবো না' এমন নয়। থাকতেও পারি, না থাকতেও পারি। আপনি থেকে গেলে তো বাড়ির লোক ভাবনা করবে।

বাড়ির লোক।

দেবনাথ আবারও হঠাৎ উত্তেজিত হন, ঠিক বলেছেন, ভাবনা করে, রাগ করে, না খেয়ে বসে থাকে। আচ্ছা যাই।

যে এসব করে তার নাম কি বাবা?

এই তো মুস্কিলে ফেললেন। নাম কী? নাম কী? বেণু? কিন্তু ওর নাম তো বেণু নয়। আচ্ছা ওকে জিগ্যেস করবো।

বলে ব্যস্ত হয়ে চলে যান দেবনাথ।

কিন্তু কোথায় যান?

তিনি কি সেই মেয়েটা যেখানে থাকে, সেখানের পথ চেনেন?

তাড়াতাড়ি চলে আসতে পায়ের বুড়ো আঙুলে একটা ঢিলের ঠোক্কোর।

উঃ বলে বসে পড়লেন দেবদাথ।

রক্ত পড়েনিতো?

তবু ভালো। মনে পড়লো—রাস্তায় লেগে রক্ত পড়লে খুব খারাপ।

কেন খারাপ মনে পড়ছেনা, তবে খারাপ তো নিশ্চয়ই।

বাড়ি গিয়ে ভাল করে ধুলোটা ধুয়ে ফেলতে হবে।

বাড়ি!

বাড়ি! বাড়ির লোক! ওঃ! দেবনাথের একটা 'বাড়ি' আছে। ওই গেরুয়াপরা লোকটার বেশ শক্তি টক্তি আছে কিন্তু। কিছু না জেনেই বলল, আংটি পরার অভ্যাস ছিল। '....আবার বলল', দেরী হলে বাড়ির লোক ভাববে।'

দেবনাথ পায়ের ব্যথা—অগ্রাহ্য করে আবার জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করলেন! সত্যি বটে মেয়েটা বড্ড ভাবে। খায় না, কাঁদে।··· দেবনাথ তো তখন অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেন, আর এরকম শুধু শুধু রাস্তায় বেরিয়ে পড়বেন না।....কিন্তু শুধু শুধুই কি?

'না না, শুধু শুধু হতে যাবে কেন?'

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই তো মনে পড়ে যায়, 'কোথায় একটা যাওয়ার ভীষণ দরকার তাঁর।.... 'কোথায়' তা ঠিক মনে পড়েনা বটে, কেন দরকার তা'ও মনে পড়েনা, কিন্তু দরকারটা যে জরুরি তা তো খুব ভালই বুঝতে পারেন। তবে? বেরিয়ে পড়াছাড়া উপায় কী?

মুস্কিল এই, এখানের রাস্তাটাস্তাগুলো তেমন চেনা নেই, গাড়ি টাড়িও কিছু দেখতে পাননা। রাস্তার লোককে জিগ্যেস করলে, আসল জায়গাটার ঠিকানা বলে দিতে পারেনা। উল্টোপাল্টা অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলে। এইতো কখন যেন কাকে রাস্তাটা কি তাই জিগ্যেস করলেন, আর লোকটা বুদ্ধুর মত বলল কিনা, 'সকাল থেকে বুঝি কিছু খাওয়া হয় নাই?'

বুদ্ধুরা আর কানে কালারাই এমন কথা বলতে পারে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আর দেবনাথ কী কথা বলবেন? আবার মুস্কিল এই—যাকেই কিছু বলতে যাবেন, অমনি বলবে, 'কোথায় যাবেন? নাম কী?'

আসল অসুবিধে তো ওই খানেই। নামটা যে কখন কীভাবে ভুলে গেলেন? ··· সেইটা মনে পড়ে গেলেই বোধহয় বলতে পারবেন কোথায় যাবার দরকার!

জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে, এক সময় গতি শিথিল হয়ে গেল। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন দেবনাথ। এসব কোন দিকে ছিলো? এই মস্ত ভাঙা বাড়িটা, ওই ভাঙা ভাঙা মন্দিরটা, এতো বড় বিশাল একটা গাছ, তার গোড়ায় সিন্দুর মাখানো পাথরের কী যেন একটা ঠাকুর। আসবার সময় তো দেখতে পাননি। এতো সব চোখ এড়িয়ে গেছলো? আশ্চর্য তো! ....গাছপালা ওগুলোও যেন বদলে গেল।

খুব কৌতুহলী হয়ে থেমে থেমে হাঁটতে লাগলেন দেবনাথ, ভাঙা বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ছি ছি, এতোবড় বাড়িটা এভাবে ভেঙে পড়ে আছে, কেউ সারায়নি। ....এমন একটা লোক নেই যে জিগ্যেস করবেন, বাড়িটা কাদের?

গুটি গুটি ফটক ভাঙা হাঁ হাঁ করা দেউড়ীটার মধ্যে ঢুকে পড়তে গিয়েই থমকে গেলেন, ভিতরটায় শুধু আগাছার জঙ্গল। কোনখান দিয়ে তবে ঢুকে দেখবেন, বাড়িতে কেউ আছে কি না।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

কেন কে জানে এই খারাপটা।

ফটক ভেঙে যাওয়া হাঁ হাঁ করা শূন্য দেউড়ীটাও যেন দেবনাথের মত নিজের নামটা ভুলে গিয়ে বসে আছে। চলে এলেন ভয় ভয় বুকে।

এগোতে এগোতে দেখতে পেলেন, ঘাটলা বাঁধানো একটা পানা পুকুরের ভাঙাচোরা সিঁড়িদিয়ে ভিজে গামছা পড়ে একটা লোক উঠে আসছে।

লোকটার হাতে একটা জলভরা বালতি।

দেবনাথকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে উঠল, কে?

রাস্তায় মানুষ নেই দেখে অবাক হয়েছিলেন দেবনাথ। এখন আবার দেখে যেন রীতিমত অস্বস্তি বোধ হল। এখনই না জিগ্যেস করে বসে, 'নাম কি? যাবেন কোথায়?'

তা' বলল না। শুধু বলল 'কে?'

দেবনাথ ভাসা ভাসা গলায় বললেন, এই একজন মানুষ।

মানুষ তা' তো দেকতিই পাচ্ছি। বলি কোতাকার মানুষ? আগে তো কখনো দেকিনাই।

আজ দেখলে।

এডা নেয্য জবাব হল নাই। কার বাড়িতে উটেচেন।

সে ওই ওদিকে।

লোকটা একবার কঠোর দৃষ্টিতে দেবনাথের আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে ভিজে গামছা ছপছপিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। মনে হল গামছা ছেড়ে আবার ঘুরে আসবে। ···এলে তো ক্ষতি কিছুই নেই, ভয় ওই 'নাম।' নাম না জেনে ছাড়তে রাজী নয় কেউ! এ আচ্ছা বিপদ!

দেবনাথ ও তাড়াতাড়ি উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। রাস্তার বালাই নেই, মাঠ, জঙ্গল, ঝোপ ঝাড়, কাঁটাগাছ। ···চলতে চলতে হঠাৎ নজরে এলো খানিক দূরে ধানক্ষেত।

ধানক্ষেত!

কই এ রাস্তাতো কোনোদিন দেখেননি দেবনাথ। তবে কি রাস্তা ভুল করলেন? ····তাহলে? সেই মেয়েটার কাছে পৌঁছবেন কোন দিকে দিয়ে?

মুস্কিল তো!

ভিজে গামছাপরা লোকটা একটু ক্ষণের মধ্যেই একটা শুকনো লুঙ্গি এঁটে আর দুটো লোককে সঙ্গে নিয়ে এসে বললো, ভেগেচে! ইরি মধ্যিই ভেগেচে!

অপর লোক দুটোর একজন এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিল, অন্যজন লুঙ্গিধারীকেই জেরা করতে লেগে গেছে। লোকটা কী রকম দেখতে, কী সাজ সজ্জা, পুলিশের চর বলে মনে হলো কিনা।

মদ চোলাই, চালের চোরা কারবার, এসব ব্যাপার গুলোতো নিভৃত

পল্লীর হৃদয় কোটরেও ঠাঁই পেয়ে বসে আছে, তাই 'পুলিশের চর' সম্পর্কে একটা আতঙ্কও আছে।

জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে প্রথম লোকটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ওই তো ওই যাচ্ছে। মনসাতলার দিকে—

যাক ধরে ফেলতে দেরী হল না।

আর ধরে ফেললেই তো সেই প্রশ্ন।

দেবনাথ এখন আর ভয় পেলননা, খুব ক্রুদ্ধহয়ে উঠে চড়া গলায় প্রশ্ন করলেন, কেন? নাম কী দরকার? আমার নামে তোমাদের কোন কাজ? কোথাও থেকে আসিনি আমি, আকাশ থেকে পড়েছি, বুঝলে?

খি খি খি! তো বাবুমোশায়, পড়েচেন নয় আকাশ থে', কিন্তুক যাবেন কমনে?

দেবনাথের চশমাজোড়াই, এখনো দেবনাথের জন্যে 'বাবু মোশায়' সম্বোধনটা বজায় রেখেছে বোধ হয়।

যাবেন কনে?

ক্রুদ্ধ দেবনাথ বলে ওঠেন। পাতালে! তোমাদের আপত্তি আছে?

বলেই জোরে জোরে হাঁটতে থাকেন।

পিছনে তিনটে বেসুরো কর্কশ কণ্ঠ একযোগে হ্যা হ্যা করে হেসে ওঠে।

পাগলা! পাগলা!

॥ ১৫ ॥

আজ ও তোর সেই সাত পুরুষের 'বাবা'র নেগে উপুষ দিয়ে বসে থাকবি ?

তারাপদ হুঙ্কার দেয়।

অহল্যা ভারী মুখে বলে, আমি কারুর লেগে বসে নাই। খিদে নাই, খাবনি, ব্যস।

বলি খিদে নাই ক্যানো ?

সে বিত্তান্ত জেনে তোমার কাজ ? নিজের পেট ঠাণ্ডা হয়েচে, যাও শশীর বাড়ি পড়ে থাকগে।

ওঃ। তা হলে বড্ড সুখ হয় না ? বলি ট্যাকা কোতায় পাস রে হারামজাদী ? ট্যাকা কোতায় পাস ?

অহল্যা ভুরু কুঁচকে বলে, টাকার কতা আসচে ক্যানো ?

আসচে তোর ব্যাভারে। মনসা বুড়িকে দশটা ট্যাকা কবলেছিলিনা বৈরিগীর আখড়ায় নিয়ে যাবার নেগে ?

অহল্যা প্রথমটা অবাক হয়, পরে মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষেপে ওঠে। অতো করে বলে এলো বুড়িকে কথাটা গোপন রাখতে। হাতে ধরে বলেচে, দেকো পিসি যেন পাঁচকান না হয়। তক্ষুনি বলে দিয়েচে ওই দুশমনকে ?

আচ্ছা, সে ও দেখে নেবে। গলায় গামছা দিয়ে ফিরিয়ে নেবে টাকা, যেতে হবে না সঙ্গে, অহল্যা একাই যাবে।

তারাপদর তখনও রাগ যায়নি।

তাই আবার হুঙ্কার দেয়, বুনোর কাছ থেকে গামছা কাপড় কেনা, গেঞ্জি আনা করানো, আবার সোয়াগের বাপের জন্যে খড়ি পাতাতে দশট্যাকা

খরজ করে গুণীন বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা ! এসব আসচে কোতা থেকে বল ? বল বলচি ।

অহল্যা ক্ষেপে ওঠে । বলবনি । বলবনি কী করবি ? চুলছাড় নইলে রক্কে রাকবনি ।

তারাপদ আজ হেস্তনেস্ত করতে চায় । অহল্যা যদি ওর ওই বাপে না তাড়ায় তো তারাপদ লোক নাগিয়ে তাকে এমন ধোলাই দেবে, ে ব্যাটা পালাতে পথ পাবে না ।

ওকে আজ আমি তাড়িয়ে ছাড়বো ।

তাড়া ! আমিও তোর হাতে দড়ি দেওয়া করিয়ে ছাড়বো । পাড়া লোকের কাছে বলে কয়ে এসে গলায় দড়ি দে আড়ায় ঝুলবো ।

এই । এই এক অস্ত্রে জব্দ করে রেখেছে অহল্যা তারাপদকে ।

চুল ছেড়ে দিয়ে হিংস্র গলায় বলে, আচ্ছা, আজ ছাড়লাম । তে আমিও তারাপদ বাউরি । দেকবো কে তোর ট্যাকার জোগানদার এদিকে তো একে বাপ পাতিয়ে সোয়াগ করতেচিস, আবার কোতা 'দাদা' পাতিয়ে সোয়াগ খেতেচিস কিনা, দেকি ।

যথারীতি হন হন করে চলে যাচ্ছিল , আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে কড়া গল বলল, শালার আঙুলে যে দুটো আংটি ছেলো, কোতায় রেকেচিস ?

সে খোঁজে তোর দরকাব ?

আচে দরকার । দে বার করে ।

যে আমি পাতকোর মদ্যে ফেলে দেচি ।

কী বললি ? পাতকোর মধ্যে ফেলে দিচিস ? আমি কচি খোকা তাই এই বুজ দিচিস ? হারামজাদা, নক্কীছাড়া মেয়েমানুষ ! দু'মুবে সাপ ! আংটি তালে তোর সেই ভাবের নোককে দিয়েচিস ?

অহল্যাও সতেজে বলে, দিয়ে থাকি দিয়েচি বেশ করিচি । তো মতন পিচাশের হাতে যে পড়েচে, সে যে ঘরভেঙে বেইরে যায়নি, এ ঢের । যা বেরো ।

আচ্ছা !

বলে ক্রুর নিশ্বাস ফেলে চলে যায় তারাপদ। ওই শালা যতোদিন আসেনি এতো এমনধারা ছিল না অহল্যা। মার খাওয়ার সময় মার খেতো, সোহাগ খাওয়ার সময় সোহাগ খেতো ! মুখে মুকে চোপা অবিশ্যি করতো বরাবরই, গলায় দড়ি দেবার ভয়ও দেখাতো, কিন্তু এমন হিংস্র ভাবে নয়। নিজেও যে তারাপদ এতো হিংস্র ছিল না। তা খেয়াল করে না।

কিন্তু তারই বা দোষ কী ?

লোকে তাকে নিয়ে হাসি মস্করা করছে, টিটকিরি দিচ্ছে, ভ্যাড়া বলছে, কতো সহ্য হয় ? বিশেষ করে আজকের টাকার কথায় মাথায় আগুন জ্বলে গেছে।

দশটা টাকা ! সোজা না কি ? একী শশীর তাড়ি বেচা পয়সা ? যে মা বাপ নেই তার ? পেল কোথায় ?........

॥ ১৬ ॥

তারাপদ চলে যেতে, অহল্যা বাইরের দরজা আটক করে দেয়। আস্তে রান্নাঘরের কোণের জলের ঘড়া বসানো টিপিটার পিছনটা শাবল দিয়ে খুঁড়ে ফেলল একটু হাত ঢুকিয়ে একটা পেতলের ঘটি তুলল।

ঘটির মুখটা একটা বাটি চাপা দিয়ে মাটি নেপা। যেন মিষ্টির হাঁড়ির মুখে সরা ঢেকেছে।

খুলে বার করল একখানা পুরণো চিঠির খাম। তার থেকে সন্তর্পণে বার করল, খান তিন চার দশটাকার নোট, আর পোখরাজের আর গোমেদের সেই আংটি দুটো! অন্ধকারে ঝকমকিয়ে উঠল।

এই নোট পোরা খামখানা ছিল দেবনাথের সেই আদ্দির পাঞ্জাবীর পকেটে। প্রথম দিনই যখন দেবনাথ জামাটা খুলে রেখে শুয়ে পড়েছিলেন, খামখানা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

অহল্যা তুলে দেখেই শিউরে লুকিয়ে ফেলেছিল। তারাপদর চোখে পড়েনি ভাগ্যিস। পড়লে, তক্ষুনি চলে যেতো তাড়ির আড্ডায়।

একসময় অহল্যা আংটি দুটোও চেয়ে নিয়ে এই গোপন গুহায় তুলে রেখেছিল, তারাপদরই ভয়ে। এখন সবসুদ্ধু খামটাকে পেট কোঁচড়ের মধ্যে শক্ত করে বাঁধলো, গর্তটা আবার বুজিয়ে ফেলে ফের জলের ঘড়া বসিয়ে রাখলো, চুলটাকে আঁট করে জড়িয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে এলো।

দেখা যাক নিজেই যে সেই বৈরিগীর আখড়ায় যেতে পারে কিনা। তিনি না কি মানুষের মুখ দেখে সব বলে দিতে পারেন। তাহলে হয়তো বলে দিতে পারবেন, কে ওই লোক, কী তার নাম, কোথা থেকে ছিটকে ভুল পথে চলে এসেছে সে। আর-হয়তো বেভুল রোগটা ভাল করে দিতেও পারেন। আজ নিজে দেখে আসবে, কাল বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

॥ ১৭ ॥

ভোলা বৈরাগী কপালে হাত ঠেকিয়ে আক্ষেপের গলায় বললেন, তুমি মা যে মানুষের কথা বলছো, সেই মানুষই ঘণ্টা কতক আগেই এসেছিল। হ্যাঁ সবই ঠিক ঠাক মিলে যাচ্ছে। ....তা দেখোগে এতোক্ষণে বোধহয় ঘরে ফিরেছেন।

অহল্যা বসে পড়ে বলে, অবোধ বেভুল মানুষ, পথ আস্তা চেনা নাই, তিনি কি আর পারবে? সোমেস্তো দিনডা খাওয়া নাই—

থেমে যায়।

ভোলা বৈরাগী বলেন, 'বাবা' বলে ডেকেছো—তাই না?

অহল্যা আস্তে মাথা হেলায়।

তো ভাবনা কোরো না মা! পৌঁছে যাবেন। গরুটা বাছুরটা ছাগলটা হাঁসটাও পথ হারিয়ে ফেললে, ঠিক চিনে চিনে ঘরে ফিরে আসে। যাও বাড়ি যাও। পেয়ে যাবে।

অহল্যা তবু ওঠে না, মিনতির গলায় বলে, ওই শেতলাতলার সুবুদ্দি ঠাকুর বলেচে, শত্তুরতাই সাদতে, কে ওনাকে গুণ তুক করে দেচে। আপনি ভালো করে দ্যান বাবা!

বৈরাগী হাসেন, সুবুদ্ধিতে এমন কথা বলে না মা, তিনি তা'হলে দুর্বুদ্ধি ঠাকুর। কেউ কাউকে কিছু করে দিতে পারে না, ভালোও না, মন্দও না। এই হঠাৎ সব কিছু ভুলে যাওয়া এ একটা ব্যাধি। উৎকট ব্যাধি। হাজারো রকমের উৎকট ব্যাধি আছে জগতে, লোকে তার হদিস পায় না, তাই বলে, 'তুকতাক করেছে, অপদেবতায় পেয়েছে, বলে, পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে,হ' কিছু না কিছু না। সবই অসুখ।

অহল্যা একথা গায়ে মাখে না, জেদের গলায় বলে, ও কতা শুনবনি

বাবা। এ আপনার আমারে ছেলে ভুলোনো কতা! এই যে আমার ওনারে দেকামাত্তর মনে জাগলো, আমার চেরকালের আপন জন, আমার পুব্‌বো জন্মের বাপ, এটা কি আমার ব্যাধি?

না, তা বলতে চাই না।

ভোলা বৈরাগী হাসেন। তবে হয়তো তোমার কথাই সত্যি।

তবে? তবে ওনারে ভালো করে দ্যান বাবা। ঘরে আমার সোয়ামীটি মানুষ ভাল না, মান সম্মান রাকেনা। কোনদিন তাইড়ে দেবে—

কেঁদে ফেলল অহল্যা।

তারপর চোখ মুছে বলল, তবে এট্টি দায় আপনারে নেতে হবে। এই জিনিসডা আপনার কাচে গচ্ছিত রাকতে হবে।

পাশফিরে আড়াল করে বার করে পেট কোঁচড়ে বাঁধা খামখানা। তার থেকে বার করে জিনিস কটা।

আমি? আমি এসব কী গচ্ছিত রাখবো? না না! আমি বৈরিগী ফকির মানুষ। না না তুলে নাও।

অহল্যা জোরালো গলায় বলে, ঘরে নে গেলে, আর রক্কে রাকতে পারবনি বাবা। অ্যাত্যোদিন অনেক কষ্টে রেকেচি। দেকতে পেলে কেড়ে নে' তাড়ির দোকানের দ্যানা শুদবে। ওরে বিশ্বাস নাই।

বৈরাগী ঘোরতর আপত্তি করেন, অহল্যা তার ওপর জেদ করে। ওই মানুষ যখন ভাল হয়ে যাবে, তখন অহল্যা নিজে গিয়ে তার জিনিস তার হাতে তুলে দেবে।

ভালো মুস্কিলে ফেললে তো—

বৈরাগী বলেন, তো আমাকেই বা বিশ্বাস কী? আমিই যদি নিয়ে ভেগে পড়ি?

অহল্যা দুটো কান মলে।

এমন কথা কানে শুনলেও অপরাধ।

কথার মাঝখানে পাশে ফেলে দেওয়া পুরনো খাম খানায় চোখ

পড়ে যায় বৈরাগীর। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে বলেন, এটি তুমি কোথায় পেয়েছ মা ?

ওই তো ! বাবার পানচাবি জামার পকেটে ছেল, ট্যাকা সমেত। আমার ঘরে লুবিষ্ঠের বাস, তাই ঝটপট নুইকে তুলে রেকেছিলাম।

আহা !

বৈরাগী বলেন, চোখ থাকতে অন্ধ ! অ্যাতোদিন টের পেলে, নিরু-দ্দেশ মানুষের হদিস পাওয়া যেতো। এইতো দোরের গোড়ায়, মাহেশের এক ডাক্তারের বাড়ির ঠিকানা। সেখানে খোঁজ করতে পারলে—আহা !

অহল্যা হাঁ করে তাকিয়ে বলে, চিঠি তো নাই শুদু তো এন্‌ভেলাপ্।

ওতেই কাজ হতো মা। চিঠি যারই হোক—ওনার পকেটে যখন পাওয়া গেছে, সন্ধান তো একটা মিলবেই।

তো সেখেনে কেমন করে যেতে হবে বাবা ?

বৈরাগী সস্নেহ গলায় বলেন, তোমায় যেতে হবেনা মা, এই ভবঘুরে ছেলেটাই যাবে। ওঁকে দেখেই অনুমান করেছিলাম, বড় ঘরের মানুষ !

তো ওতে কী নেকা আচে বাবা ?

লেখা আছে ? শ্রীদেবনাথ রায়, ডাক্তার রমেন সেনের বাড়ি। মাহেশ, রথতলা।

অহল্যা বিহ্বল মুখে বলে, ওর মধ্যে কোনটা ওনার নাম বাবা ?

কী জানি, ওই দেবনাথ, না ডাক্তার রমেন সেন। বুঝতে পারছিনা। গিয়ে জানি।

অহল্যা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, আমার মন নিচ্চে দেবনাত। দেবতার মতোন ভাব।···

আচ্ছা বলতে পারো কতোদিন হলো উনি এসেছেন ?

ওই-তো বাবা। মায়েশের রত দেকে দু'দিন বাদ ফেরা হচ্চে, হঠাৎ গো-গাড়ির ধারে এসে পড়ে বললো, আমিও যাবো তোমাদের সন্‌গে—

বৈরাগী ডাকের ছাপের তারিখটা দেখলেন। তারপর উঠে পড়ে

বললেন, দেখি রাধামাধব কী করেন।

উপবাসক্লিষ্ট এবং পথশ্রমক্লিষ্ট অহল্যা যখন ঘরে ফেরার মুখে, তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। তবু মানুষ চিনতে ভুল হয় না। 'বেভুল' লোকেরও না।....

দাঁড়িয়ে পড়ে কাঁদো কাঁদো উত্তেজিত গলায় প্রায় চীৎকার করে ওঠে, কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি বেণু? তোকে খুঁজতে খুঁজতে হাজার হাজার মাইল হাঁটতে হল আমায়!

বেণু! বেণু! বেণু!

অহল্যা নামের কেউ নেই। কোথাও নেই

অহল্যার ভিতর থেকে কান্না উথলে আসে।

সেই কান্নাটাকে কথায় প্রকাশ করে আবার আপনি আমারে না বলি-কয়ি বেইরে গেচলে বাবা? দিনভোর নাওয়া নাই, খাওয়া নাই।

নাই তো নাই। কোথায় গিয়েছিলাম জানিস? এক সন্নিসী, গেরুয়া পরা। আমায় দেখেই বললেন, কিনা হাতে আংটি ছিল। কী আশ্চর্য ভাব?

অহল্যা কি এখনই বলে ফেলবে, বাবা গো আমিও সেইখানেই গেচলাম। আমার নিচ্চই মন নিচ্চে, উনি আপনারে ভালো করে দেবে।....

কিন্তু না, সে কাহিনী ফাঁদলে এখন অনেক দেরী হয়ে যাবে!

আগে মানুষটার খাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, ভাত কী খাবেন? বোধহয় না। চাষাভূষো তো না, যে সময় বলে কিচু নাই, পেট জ্বললেই তাতে ভাত ঢালবে।

চিঁড়ে দুধ আর কলা মেখে খেতে বসিয়ে, কাছে বসে পাখা নাড়তে

নাড়তে বলবে, বাবা গো, তাহলে শুনুন বিতান্ত—

বাবা, খেতে আসো।

দেবনাথ বলে ওঠেন, তোর যেমন, খাওয়া খাওয়া বাতিক বেণু! দেখছিস একটু শুয়ে পড়েছি।

আবার সেই 'বেণু।' 'অহল্যা' বলে কোনো শব্দ নেই জগতে।

॥ ১৮ ॥

থিতিয়ে আসা সাগর জলে আবার প্রবল জোয়ার ওঠে। এক গেরুয়া-ধারীকে ঘিরে প্রবল কলরোল।

হ্যাঁ ওর ছেলের চিঠি। ....এটা মেয়ের বাড়ি। মানে আর কি মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। এই যে ডাক্তারবাবু....এই মেয়ে।...

হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা পোখরাজের, একটা গোমেদের। ভয় হতো, হয়তো ওই আংটি দুটোর লোভেই কেউ কোথাও সরিয়ে নিয়ে গিয়ে....দুর্গা দুর্গা! আজকাল তো একভরি সোনাই অনেক। দুটোতে অনেক বেশী ছিল।....

আপনি বলছেন, নিজের চোখে দেখেছেন? আজই সকালে? কিন্তু বলছেন রং ময়লা? তবে? গৌরবর্ণ চেহারা।

ময়লা হয়ে গেছে মা। দেখে টের পাওয়া যাচ্ছিল গৌরবর্ণ। এখন ছাইচাপা আগুন।

পরণে কী বললেন? গেঞ্জি আর লুঙ্গি? ইস! ভাবা যাচ্ছে না। ....পুরণো স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছেন? ....নিজের নাম মনে করতে পারছেন না? ও বাবা? বাবা গো? নিশ্চয় তোমায় সেই পাড়াগেঁয়ে ডাইনী কিছু তুকতাক করেছে। ....

বেণু কলকাতার মেয়ে। ডায়োসেশন স্কুলে, আর ব্রেবোর্ণ কলেজে পড়ে মানুষ হয়েছে। বেণুর স্বামী বিজ্ঞানের ছাত্র, বেণুর শ্বশুর একজন পসারওলা ডাক্তার! তবু বেণু অনায়াসে তার প্রপিতামহীর ভাষায় কথা বলে উঠতে লজ্জা পেল না।...

॥ ১৯ ॥

যে অগতির পথে গোরুর গাড়ি ছাড়া আর কোন উপায় নেই, প্রগতির আর এক রথ, সে পথে হানা দিতে শিখেছে। সে হচ্ছে জীপ গাড়ি। সব মাড়িয়ে, সব গুঁড়িয়ে যেতে জানে সে।

তেঁতুলগাছি গ্রামের কাদাখোঁচা পথ দিয়ে মহাকালের অমোঘ রথচক্রের মত সব মাড়িয়ে চলেছে তার কাঁটাদার চাকা নিয়ে সেই এক জীপ!

দুধারে গাছপালা ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি ঝুঁকি। কী কাণ্ড! জেনে ফেলেছে সবাই কারণটা।

যাক তারাপদর বৌ একটা কাজের মত কাজ করেছিল বটে! ভবিষ্যৎ দিষ্টি আছে ছুঁড়ির!

বিহঙ্গর বৌ বলল, য্যাখনই কোমর বেঁদে ওনাকে গাড়িতে তুলেচে, ত্যাখনই মনে সন্দ জেগেচে অবিসন্দি আচে।....

বিহঙ্গ খিঁচোয়, তো তুই বা সে অবিসন্দিটা করতে গেলিনে কেন? শুনেচিস তো কতা? হাতে হাতে নগোদ পাঁচহাজার ট্যাকা পুরোসকার।....

ওরে পদো, খুব মাত্তা মেরে নিলি বটে ঘরে শোউর পুষে! ··তো অ্যাকদিন ফিষ্টি খাইয়ে দিস বাবা।

তারাপদ এখন উঁচু পোষ্টে।

মদগর্ব গলায় বলে, সে তো ওনারা আলাদা দেবে বলেচে। গেরাম সুদ্দু লোক যাতে অ্যাকদিন খিচুড়ি মান্‌সো খেতে পারে, সেই বুজে ট্যাকা দে যাবে জামাই!

জামাই !

হ্যা হ্যা হ্যা, পদো, তোর পোষ্টটা তালে গ্যালো অ্যাঁ ?

আহা টেম্পোরারি পোষ্ট ছেলো বৈ তো না।

উঁকি ঝুঁকির দলে দেবনাথও ছিলেন, তাঁকে টেনে এনে বাড়ির মধ্যে পোরা হয়েছে। উপযুক্ত প্রমাণসহ অফিসিয়ালভাবে সমর্পণ করতে হবে। পাড়ার সবাই সাক্ষ্য দেবে, হ্যাঁ এই লোকের বাড়িতেই এতোগুলো দিন কাটিয়েছেন দেবনাথ।

রমেন ডাক্তার আর তাঁর ছেলে এসেছেন, এসেছে দেবনাথের ছেলেও। বেণু আসতে চাইছিল, তাকে আনা হয়নি। জায়গায় কুলোবেনা। তাছাড়া—বাড়িতে ব্যবস্থা রাখতে হবে তো ?

হঠাৎ সবাইকে দেখে স্মৃতি শক্তি ফিরে আসতেও পারে তো বাবা ?

রমেন ডাক্তার বললেন, অসম্ভব নয়। হঠাৎই তো লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আবার নাও হতে পারে। এ একটা অসুখ তো—

বেণু তো বলছিল, গাঁয়ের মেয়েরা না কি শেকড় টেকড় খাইয়ে এমন করে দিতে পারে।

ডাক্তার তাঁর বেহাইয়ের ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, মজ্জাগত কুসংস্কার। তবে মনে রাখতে হবে, গ্রামে গিয়ে স্মৃতিভ্রংশ হননি, উনি ভ্রংশ হয়েই, ওদের ওখানে গিয়ে পড়েছিলেন। মন্দ মতলব থাকলে আংটি দুটো রেখে দিত না।···

পুরস্কারের লোভটা ছিল। প্রথমেই তো কাগজে দেওয়া হয়েছিল।

এরা কি আর কাগজ ফাগজ পড়ে বাবা ?····

॥ ২০ ॥

দেবনাথ ভয় ভয় গলায় বললেন, ওরা সব কারা—ইয়ে।

তারাপদ ঘাড়ের কাছেই আছে, বলে উঠল, অহোল্যা।

হ্যাঁ হ্যাঁ! অহল্যা! জীপগাড়িতে ওরা কারা এসেছে অহল্যা?

অহল্যা শান্ত গম্ভীর ভাবে বলে, আপনারে নিতে।

সে কী? কেন? আমায় নিতে আসবে কেন? আমি ওদের সঙ্গে যাবো কেন?

ওঁনারাই তো আপনার আপন লোক।

বাঃ। জানিনা চিনিনা আপন লোক হয়ে গেল? না ওদের যেতে বল।

তা হবেনি বাবা, আপনাকে যেতে না দিলি, আমাদেরকে পুলিশে ধরবে।

পুলিশে ধরবে তোমাদের? ইয়ার্কি না কি? এই আমি বসে রইলাম, দেখি কেমন পুলিশে ধরে।

না বাবা না, পুলিশে ধরবে ক্যানো? চটপট এগিয়ে এসে তারাপদ বলে ওঠে, মেয়ে আপনার সঙ্গে মস্করা করতেচে।

অহল্যা ক্রুদ্ধ গলায় বলল, তুমি যাবে এখেন থেকে?

যাচ্চি বাবা যাচ্চি! উঃ! পুলিশ আর কোতা? এই ঘরেই। তারাপদ ভয়ে ভয়ে চলে যাবার মুখে হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে দেবনাথের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণামে শুয়ে পড়ে হাউমাউ করে বলে, গরীব ব্যাটার ঘরে অনেক কষ্টো পেয়ে গেলেন বাবা! এই পায়ে ধরে মাপ চাইচি।

অহল্যা গম্ভীর গলায় বলল, তুমি যাবে?

চলে গেল তারাপদ।

পালিয়েই গেল।

অহল্যা শান্তগলায় বলল, আংটি তুটো পরে ন্যান বাবা।

না। না। ও আমার অস্বস্তি হয়।

না। অসোয়াস্তি কিসের? আঙুল থে খুলে নেছলাম, আবার পইরে দি—

বলেই কথা শেষ না করে মুখটা ফেরায় অহল্যা। তারপর—

জোর করে পরিয়ে দিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

পুলিশ তা'হলে আসছেনা তো?

না।

গাড়িটা চলে গেছে?

গাড়ি চলে যাবে কেন? যেতে হবে তো?

ঠিক আছে। ঠিক আছে। সবাই যাবো—তুমি, আমি! আরো সব যারা আছে—অ্যাঁ। …কিন্তু ও যাবেনা তো?

॥ ২১ ॥

আড়াল থেকে দেখে জামাই চিনে গেছে। যদিও চিনবার উপায় বড় নেই। তবু কাঠামোটা বলেদিলে হ্যাঁ,এই সেই দেবনাথ রায়, যে লোকটা মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে ছাপ্পান্ন বছর বয়েসে হারিয়ে গিয়েছিল। আবার সবাই জীপে। ওরা ঠিক করে এসেছিল, একসঙ্গে সবাই হৈচৈ করে নামবেনা, এবং অনেকদিন পরে দেখা হল, এমন ভাবের ধার দিয়ে যাবে না। যেন রোজের ঘটনা। যেন রোজই কোথাও যান গাড়ী করে।

দেবনাথের ছেলে মুক্তিনাথ এসে কোনো দিকে না তাকিয়ে বলল, বাবা চল। গাড়ী এসেছে।

তুমি ? তুমি কে ?

দেবনাথের ভঙ্গীতে উত্তেজনা। তোমায় কোথায় যেন দেখেছি।

আমি ? আমি তো মুক্তি। কেন ? রোজই দেখছেন।

মুক্তি ! মুক্তি .... ও ঃ খুব চেনাচেনা লাগছে তো। কোথায় ছিলে তুমি ? কোথায় যেতে বলছো ?

বাঃ। কোথায় আবাব ? অফিসে।

অফিসে !

দেবনাথ হঠাৎ হা হা করে হেসে ওঠেন, অফিসে, এই পরে ? ছেলেটা বলে কী ?

না না পোষাক তো ওখানে রয়েছে।

রয়েছে ? তবে চল। অফিসে। আচ্ছা। অফিসে।

গাড়িতে গিয়ে ওঠেন দেবনাথ ওদের সঙ্গে। পরক্ষনেই চেঁচিয়ে ওঠেন,

এ কী? ও উঠল না?

কে?

ওই যে—ওই যে অহল্যা! হ্যাঁ হ্যাঁ অহল্যা।

ওরা উত্তর দিল না। গাড়িতে ষ্টার্ট দিল।

দেবনাথ গাড়ির মধ্যে থেকে মুখ বাড়িয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, অহল্যা! কী হচ্ছে? এতো দেরী কেন? কাজ টাজ রাখ। চলে আয়! এতো কী কাজতোর? গাড়ি ছেড়ে দেবে যে? তুই না এলে যাব কী করে?....একী! একী!

....

গাড়ি ছেড়েই দেয়, চাকার ধূলো উড়িয়ে।

সেই ধূলোর সঙ্গে উড়ে যায় একটা অবোধ লোকের বিস্ময় আর্তস্বর! ...একী! ওযে পড়ে রইল। গাড়ি ছেড়ে দিলে যে?

কিন্তু কেউ 'পড়ে রইল, বলে, কবে আর কার ষ্টার্ট দেওয়া গাড়ি এগিয়ে না যায়?

॥ ২২ ॥

গাড়ির চাকার ধূলো কিছুক্ষণেই উড়ে যায়, মিলিয়ে যায়, কিন্তু গাড়ির পিছনে, সমালোচনার যে প্রবল ঝড় ওঠে, তার ধূলো মিলোতে চায় না।···হয়তো অনেক অনেক দিনই মিলোবেনা, থেকে যাবে এই তেঁতুল-গাছি গ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে।

সমালোচনা অবশ্য 'অহল্যা' নামের মেয়েটাকে নিয়ে।

কিছুক্ষণ আগেই যারা অহল্যার চালাকির আর দূরদর্শিতার তারিফ করছিল, তারাই তার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়ে ফুরোতে পারছেনা।

একী মুখ্যুমি!

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠ্যালা!

কেউ কোথাও কখনো করেছে এমন বোকামীর কাজ!

পাঁচ পাঁচ হাজার ট্যাকা!

কতোবার 'কুড়ি' গুণলে অতোটা হয় কে জানে।

সেই ট্যাকা তোর হাতে তুলে দেতে এলো!

আর তুই কিনা সেই মান্যিমান লোকগুনোর মুকের ওপর বললি কিনা, ও ট্যাকা আপনারা ফেরৎ নে যাও!....শুনলে তো 'বাপ' বলেচি। বাপ বেচা ট্যাকা হাতে ধরে নিতি পারবনি।

বেচা? ছি ছি, বেচা কেন? ইয়ে, বকশীস আরকি।

ওই অ্যাকই কতা।

উঃ গোঁ দ্যাকো। তেনারা বলল, বেশ, আপনি হাতে করে না ন্যান, আপনার সোয়ামী নিন!

বলল কিনা, ওতো মনপ্রাণকে চোকঠারা। সোয়ামী নেওয়া আর আমার নেওয়ায় তপাৎ কী?

তারাপদর তখন অবস্তাটা দেকেচিলি?

দেকেচি বৈকি! ধরে রাকা যায় না। আমি তো পেছন থেকে

একটা হাত টেনে ধরে—

আর কিছু না বরের ওপর রিষ ! ওই যে পদ একটু রাগ ঝাল করতো। তা এমন সব ব্যাটাছেলেই করে থাকে !....পরিবার একটা ব্যাটাছেলেকে ঘরে এনে পুরে বাপই বলুক, আর ভাইই বলুক, আর ব্যাটাই বলুক, হেদিয়ে পড়লেই দিষ্টিকটু !

কম আদিখ্যেতা তো করো নাই তুমি।....

তা, সোয়ামীর ওপর শোদ নিতি, এই কাণ্ডটা করলি তুই ? 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গো।' বুদ্দির গলায় দড়ি। সোয়ামীর ওপর তেজ দ্যাকাতে আখের ঘোচালি ? পদর হলিই তোর হওয়া !

না তো কী ? ওই ট্যাকায় পদ হাল বলদ কিনে জমি কিনে, চাষী-বাসী হতে পারতো, জন্মোভোর উঞ্ছোবিত্তি করে কাটাতে হতোনি। নিদেন, চালে খড়ও পড়তো।....তা নয়, অহোংকার দেকিয়ে বলা হলো কিনা, 'ফেরৎ নে যেতে মন না নিলে, কোনো ধম্মো থানে—'উচ্ছুগ্যু করে দাও গে যাও।'....

বিশ্বেস হয় না গো ! সাদে শাস্তরে বলেচে 'অহোল্যা পাষাণী।' কী নোকসান ! কী নোকসান !

আফশোষের জের মিটতে চায় না।....

কিন্তু কাঠগড়ার আসামীটার গায়ে এসবের কিছুই স্পর্শ করে না। স্বামী যে বাঘের হুঙ্কারে বলেছে, 'আমি যদি ওই নক্কীছাড়ি হারামজাদিকে দূর করে দে' আবার বে' না করি, তো আমি তারাপদ বাউরিই নই।' সেটাও মনে পড়ছেনা। সে তার পরমপ্রাপ্তির সুখে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

'বেণু' নয়, 'বেণু' নয় 'অহল্যা' ! অহল্যা গাড়ি ছেড়ে দেবে যে ! তুই না এলে যাব কী করে ?''''আরে আরে ! একী ? ওযে পড়ে রইল।'

—সমাপ্ত—